জয়তু

– পিয়াল মাহমুদ শাকিল

মা চশমা চোখে কাথা সেলাই করছেন তার অনাগত নাতি, নাতনির জন্য। তিন বছরের ভাগ্নি ইমু এসে মায়ের কোলে বসে জিজ্ঞাসা করে, নানু, ওটা কি?

মা বলেন, চশমা।

আমিও চশমা পরবো। ইমুর আবদার।

ওতে পাওয়ার আছে, ওটা তোমার হবে না।

না, আমি পড়বোই। ইমুর জেদ। পরক্ষণেই কান্না।

ব্যস, কি আর করা! বাধ্য হয়ে বিকেলবেলা ইমুকে নিয়ে শপিং সেন্টারে গেলাম চশমা কিনতে। ফেরার পথে দেখলাম বোরখা পরা দুটি মেয়ে অন্য আরেকটি দোকানে সানগ্লাস দেখছে। বোরখার ফাকে তার আনত নয়ন দুটি দেখে বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠলো।

রিকশায় উঠতে যাবো ঠিক তখনই ডাক এলো, মাহমুদভাই, শুনুন।

চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি আমাকেই ডাকছে। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। অচেনা লাগছে, তবুও কাছে গেলাম।

আমি আপনার ছোট বোনের বান্ধবী স্বপ্না। পাশের জনকে দেখিয়ে বললো, ও শম্পা। আপনাকে অনেক আগে থেকেই চিনি। কিন্তু কোনোদিন কথা হয়নি আপনার সঙ্গে। আপনার কথা প্রায় প্রতিদিন শুনি কলেজে আকলিমার কাছে।

আকলিমা আমার ছোট বোন।

স্বপ্নাই বললো, যাক সে কথা। এবার একটি সানগ্লাস পছন্দ করে দিন তো মাহমুদ ভাই। আমরা পছন্দ করতে পারছি না।

অনেক ঘেটেঘুটে *নাইট কুইন* নামের একটি সানগ্লাস আমাদের তিনজনেরই পছন্দ হলো। শম্পা এমনিতেই কথা কম বলছে। যা বলার স্বপ্না আর আমি বলছি।

দশ মিনিটেই দুজনে বেশ ফৃ হয়ে গেলাম। শপিং সেন্টার থেকে বের হওয়ার পথে ইমুর হাতে চিপস কিনে দিল তারা।

আমাদের সঙ্গে সময় নষ্ট করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বলে স্বপ্না যখন নাইট কুইন সানগ্লাস চোখে পরে রিকশায় উঠছিল, সত্যি তাকে নাইট কুইনের মতোই লাগছিল। কালো বোরখার ঢাকা সর্বাঙ্গে, সর্বশেষ চোখ দুটিও। শুধু সানগ্লাসের ফাকে ফর্শা কপালটুকুই দেখা যাচ্ছিল।

তারা চলে গেলেও স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকি।

আপেল সদৃশ্য চশমা পরে, ইমু যখন বললো, মামা, বাসায় চলো তখন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বাড়ির পথ ধরি।

এর কিছু দিন পর বাড়ি ফেরার পথে স্বপ্নার রিকশা এসে থামে। নাইট কুইন সানগ্লাস দেখে চিনতে পারি। নেকাবের নিচে সানগ্লাসের আড়ালে থাকে তার চোখ। আমি পড়তে পারি না তার চোখের ভাষা। কিন্তু আমার চোখে সানগ্লাস নেই। সে কি আমার চোখের ভাষা বোঝে? সেকি আমার চোখের ভাষা জানে? এসব কথা যখন ভাবছি তখন তার রিনিঝিনি কণ্ঠে বেজে উঠলো, আসুন না আমাদের বাসায় একদিন। খুব খুশি হবো।

মিনতি ঝরে যেন তার কণ্ঠে।

চলতে চলতে কেবল ভাবছি, স্বপ্না না জানি কতো সুন্দর তাকে যদি বৌ করা যেতো ইত্যাদি। দুদিন পরেই শুনি আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আমার বিয়ে, অথচ আমাকেই জানানোর কোনো প্রয়োজন মনে করলো না

কেউ–ই? পাত্রী কে, কি আশয়–বিষয় কিছুই জানি না। হতাশা, রাগ, ক্ষোভ, অভিমান সব গিয়ে পড়লো ভাইয়ার ওপর। আমাকে কি পাত্রী দেখানোর প্রয়োজন মনে করলো না, এটা কি আদি যুগ? অভিভাবকরা যাকে খুশি তাকে ধরে এনে বিয়ে পড়িয়ে দিল, ব্যস? তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বপ্নার সানগ্লাস আটা মুখখানা। মনের পর্দায় দেখতে থাকি বোরখা বিহীন, চশমা বিহীন স্বপ্নাকে। স্বপ্নাকে যদি স্বপ্নের রানী করা যেতো!

রাগে ফুলতে থাকি। ভাবীকে যা ইচ্ছা তা–ই বলি।

প্রতিউত্তরে ভাবী হাসেন।

উচু স্বরে চিৎকার চেচামেচি করি, আমাকে কি কোরবানির পশু পেয়েছে যেভাবে খুশি সেভাবে জবাই করবে? আমার কি কোনো ইচ্ছা, অনিচ্ছা নেই?

এতে ভাবী, ছোট বোন আকলিমা, দাদি হেসেই খুন। চশমার ফাকে মিটি মিটি হেসে মা স্থান ত্যাগ করেন। এদের এমন কার্যকলাপে তাজ্জব বনে যাই। আমি রাগবো, হাসবো, না কাদবো ভুলে যাই।

ভাবী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বলেন, তোমার আবার ইচ্ছা, অনিচ্ছা? তোমার আবার পছন্দ–অপছন্দ? আবার হাসতে থাকেন।

রাগে কাপতে কাপতে বলি, আমার পছন্দের কেউ কি থাকতে পারে না?

ভাবী দুষ্টমির হাসিতে বলেন কে, ওই চশমাওয়ালি? যাকে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে চশমা কিনে দিয়েছিলে?

আবার সকলের সম্মিলিত হাসি।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, সত্যিই তো, সেদিন স্বপ্নার চশমার টাকা তো আমিই দিয়েছিলাম। দুজনে তখন এতো ভাবাবেগ ছিলাম যে, কেউ–ই তা খেয়াল করিনি। আর এরা সবাই তা জানলোই বা কেমন করে?

সবার কাছে বোল্ড আউট হয়ে নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভাবছি। শেষ পর্যন্ত আমার মতো *শান্ত–শিষ্ট, লেজ বিশিষ্ট* ছেলের জীবনেও প্রেম নামের স্ক্যান্ডাল বা কেলেংকারি ঘটলো?

ততোক্ষণে ছোট বোন আকলিমা আমার বিয়ের কার্ড এনে ভাজ খুলে পড়তে লাগলো। পিয়াল মাহমুদ (শাকিল)–এর সঙ্গে সাবিনা ইয়াসমিন স্বপ্নার শুভ বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছে।

এর আগে–পরে কি লেখা ছিল এর কিছুই আমার কানে ঢুকলো না। অচেনা এক ভালোলাগায় ভরে উঠলো সারা দেহ–মন। বাহারি বা রঙিন চশমা চোখে পরলে দুনিয়াটা যেমন মনে হয় তেমনি বিনা চশমায় আমার জীবনটা রঙিন মনে হলো। মনে মনে বলি, ভাগ্যিস! চশমা কিনতে গিয়ে দুজনের দেখা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলি, জয়তু চশমা।

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

অন্ধকারে

– রাজিয়া জামান মনজু

আমার বয়স তখন সবেমাত্র ছাব্বিশ। প্রথম ছেলের বয়স চার। থাকি মফস্বল শহরে। স্বামী আইন ব্যবসায় নিয়োজিত। যৌথ পরিবার। এ বয়সেই মাঝে মধ্যে মাথা ব্যথা। তাছাড়া সামান্য পড়ালেখা করতে গেলেই ব্যথাটা প্রচণ্ড আকার ধারণ করতো।

ডাক্তার দেখানের পর বললেন, সম্ভবত চোখের সমস্যার কারণেই মাথা ব্যথা হচ্ছে।

এদিকে মফস্বল শহরে তখন কোনো চোখের ডাক্তার ছিল না বললেই চলে। আমার স্বামী এবং আমি ঠিক করলাম, আপাতত চট্টগ্রাম গিয়েই কোনো চোখের ডাক্তারকে দেখাবো।

খুব কাছেরজন বলতে চট্টগ্রামে তখন আমাদের কেউই ছিল না। ফলে চার বছরের ছেলেকে নিয়ে আমরা হোটেলেই উঠলাম।

পরদিন যথাসময়ে ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম। সঙ্গে ছেলেও ছিল।

আমার স্বামীসহ ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করার পর স্বামী এবং ছেলেকে চেম্বারে বসিয়ে রেখে ডাক্তার আমাকে ঘুটঘুটে একটা অন্ধকার কামরায় নিয়ে গেলেন। সামনে হাত বাড়ালে হাতটাও দেখা যাচ্ছিল না।

এদিকে ভয়ে যেন জমে যাচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম এ কেমন চিকিৎসা? চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম নিচ্ছিলাম।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার হাতে একটা ছোট টর্চ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

লাইটটাকেই শুধু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আস্তে আস্তে অনুভব করলাম, ডাক্তারের মুখটা একেবারে আমার মুখের কাছেই। এমনকি টের পাচ্ছিলাম তার নিঃশ্বাসের বাতাসটাও আমার মুখে লাগছিল। মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যা হবার তাই হবে। সত্যি সত্যিই যদি তার মুখটা আমার মুখে লেগেই যায় তাহলে কষে একটা চড় বসিয়ে দেবো ডাক্তারের গালে।

কিন্তু তা হলো না। আমার চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটলো। কিছুক্ষণ পরই বাতি জ্বলে উঠলো।

ডাক্তার বললেন, চোখে কিছু সমস্যা আছে, চশমা নিতে হবে এই যা।

মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম, চোখ পরীক্ষা যে এভাবে করতে হয়, আমার জানা ছিল না।

আমার প্রথম চোখের ডাক্তারের নাম ছিল জাফর। খুবই ভদ্রলোক, আমার বাবার বয়সী। কোনো এক সময়ে তার স্ত্রী মন্ত্রী ছিলেন। ওই স্মৃতিটা আজও ভুলতে পারি না।

ফেনী থেকে

ছলনা

– এম.কে অনিক

সালটা ছিল ১৯৯৭ সাল। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বয়স তখন কতোই হবে! বারো কি তেরো। কেবল প্রেম রূপ অনলে পা দিয়েছি। প্রেমের বর্ণমালা মুখস্থ করা শুরু করেছি। আমার প্রেমিকা ছিল সুদর্শনা। কিন্তু তার একটা বদঅভ্যাস ছিল। সে সব সময় নিজেকে সুন্দরী বলে উপস্থাপন করতো।

একদিন আমরা ঠিক করলাম, এই শীতে কোথাও গিয়ে এক সঙ্গে সময় কাটাবো। নির্ধারিত দিনে আমরা চলে গেলাম আমাদের গন্তব্যের জায়গায়। আমার প্রেমিকা মিতু যদিও চোখে সানগ্লাস পরতো। তাকে সে মুহূর্তে মনে হতো খুব সুন্দরী। এবং মিতুর কথা একেবারে মিথ্যা নয়। মিতুর কথা সত্য। সে সুন্দরী এবং সানগ্লাস পরলে তাকে আরো বেশি সুন্দর লাগে। মনে হয় তার চেহারা মহান করুণাময় নিজ হাতে বানিয়েছে।

মিতুকে বললাম, মিতু, তোমাকে সানগ্লাস পরলে খুবই সুন্দর লাগে।

মিতু হঠাৎ করে চোখের সানগ্লাসটা খুলে আমাকে দিয়ে দিল।

অবাক হয়ে তার মুখপানে চেয়ে রইলাম। মিতু হা করে বলে, এই কি দেখছো।

মিতু আমার হাটুতে মাথা রেখে বলে, অনিক, যদি কোনোদিন তোমার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে দাও।

আমি বলি, চুপ, এ কথা মুখে আনবে না।

সত্যিকারের প্রেমে কোনো ভয় নেই। তবুও তার চোখ দিয়ে পানি টপ টপ করে পড়ছে।

তার চোখের পানি দেখে আমার খুবই খারাপ লাগলো।

তারপর আমরা গন্তব্যের জায়গা থেকে রওনা হই। পরে গিয়ে উঠি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিই।

মিতু আমার পাশে বসে বলছে, আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

আমি বলি, কেন?

মিতু বলে, তোমার বন্ধুদের বাড়ির সবাই কি মনে করছে একটু ভাবো!

বেশি কথা আমি পছন্দ করি না। বেশি কথা বললে ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট বন্ধ করে দেবো।

মিতু একটু মজা করে বললো, পারলে বন্ধু করো দেখি।

সত্যিই আমি হঠাৎ করে মিতুর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে ফেললাম। এক সময় আমি মিতুর সারাটা অঙ্গ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। এক পর্যায়ে আমার হাত দুটো তার কামিজের নিচ দিয়ে সে তার বুকে রাখলো।

তারপর আমি বাধ্য হলাম তার বুকটা টিপতে। মিতু একটুও লজ্জাবোধ করলো না।

আমি আর দেরি না করে বাথরুমে চলে যাই।

আমি বাথরুমে ঢোকার পরে মিতু ঢোকে। তারপর মিতু বলে, গোসল করবো।

আমি বলি, একটু পরে করো।

মিতু বলে, না, এখন এক সঙ্গে গোসল করবো।

লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখি।

পরে মিতু আমার সামনে তার দেহের সমস্ত আবরণ খুলে ফেললো।

লজ্জা বোধ করলাম।

পরে আমাকে দিয়ে মিতু সারাটা শরীর ব্যায়াম করিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাই।

মিতু পরে একা বাড়িতে চলে গেল। কিছু দিন পর খবর পেলাম মিতুর বিয়ে। এ কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে দেখি সব সত্য। আমার অনুমান মিথ্যা।

আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না। পরে বেছে নিলাম সিগারেট। আজ মিতু আমার পাশে নেই। এখন শুধু তার ওই সানগ্লাস আমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে। পরে মিতুর বিয়ের কার্ড তার এক ছোট ভাই দিয়ে যায়। আমি তার বিয়েতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে তার দেয়া ওই সানগ্লাসটা দিয়ে চলে আসি। এই প্রেম ছিল তার ছলনা।

নড়িয়া, শরীয়তপুর থেকে

হজ

– মোহাম্মদ আবদুল হালিম

একটি মাত্র সময় ছাড়া কোনোদিনই চশমা বা সানগ্লাস ব্যবহার করিনি। আসলে কেন জানি না নিজেকে কখনোই সানগ্লাস ব্যবহার উপযোগী চেহারার অধিকারী বলে মনে হয়নি। সে কারণেই হয়তো বা সউদি আরবের মতো দেশে যেখানে তাপমাত্রা প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রির আশে-পাশে থাকে সেখানে এসেও গত সাড়ে আট বছরে একটি মাত্র উপলক্ষ্য ছাড়া কখনোই চশমা বা সানগ্লাস কোনোটিই ব্যবহার করিনি।

এবার তাহলে সেই একটি মাত্র সময়ের কথা উল্লেখ করি। সময়টি হলো ১৯৯৭ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময় যখন পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল সউদি আরবের আল খোবার ত্যাগ করেছিলাম পবিত্র মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে। তবে আমরা প্রথমে মদিনা হয়ে গিয়েছিলাম। তাই দেরি হয়ে যাবার কারণে যখন পবিত্র মিনায় গেলাম তখন মিনার আশে-পাশে অবস্থিত সমস্ত টিনশেড বা গরমের হাত থেকে বাচার জন্য যতো ধরনের শেল্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সবগুলোই ফুল হয়ে গিয়েছিল। কারণ বেশির ভাগ লোকই সরাসরি মক্কায় গিয়ে মিনায় গিয়েছিল আর আমরা মদিনা-মক্কা হয়ে তারপর মিনায় গিয়েছিলাম।

মিনায় শেড না থাকার কারণে খোলা আকাশের নিচে আমার ছোট ভাই ও জাকির নামে একজন অবস্থান নিয়েছিলাম, অথচ গরমে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। ছাতা দিয়ে কিছুটা রক্ষা হয়েছিল। তখন সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও চোখ দুটোকে কিছুতেই রক্ষা করা যাচ্ছিল না প্রচণ্ড তাপ থেকে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে কোথাও তাকানোই সম্ভব হচ্ছিল না। তখন বাধ্য হয়েই জীবনে প্রথমবারের মতো সানগ্লাস ব্যবহার করেছিলাম যা মিনার আশে-পাশে অবস্থিত অসংখ্য ফেরিওয়ালা যাদের অধিকাংশই সুদানিজ এবং যারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস বেচে তাদের একজনের কাছ থেকে কিনেছিলাম।

সেই সানগ্লাসটি আজো সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। সেটা দেখলে আজ থেকে ছয় বছর আগেকার সেই সময়কার কথা বা স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দাম্মাম, সউদি আরব

halim-md2000@yahoo.com

দেখে না দেখে

– এ কে আজাদ বাবু

১৫ মে ২০০৩-এ আমাদের প্রিয় বন্ধু লিটনের শাদি মোবারক সম্পন্ন হলো। ঘটনাটি সেদিনই ঘটেছিল। বেচারার কপাল মন্দ। তা না হলে এমন হবে কেন! বিয়ের দিন সাধারণত কিছু মজার আনুষ্ঠানিকতা বা কার্যক্রম হয়ে থাকে। এতে কেউ পরাজিত হন আবার অন্য পক্ষকে পরাজিত করে নিজেরা মজা উপভোগ করেন। তবে সেদিনের সেই আনুষ্ঠানিকতা কমেডি না ট্র্যাজেডি তার বিচার পাঠকরা করবেন।

আমরা বরযাত্রী হিসেবে ছিলাম। তাই বরের সার্বিক নিরাপত্তা আমাদের ওপর বর্তায়, বিশেষ করে আমি ও তাপস একটু বেশিই ছিলাম। কনে পক্ষ বরের জুতা চুরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমরাও দমার পাত্র নই, সহজে ছাড়ছি না। লিটনের (বরের) জুতা জোড়া খুব যত্ন করে তাপস ধরে রেখেছে এবং সঙ্গে বরের দামি চশমাও ছিল। পাগড়ি পরার কারণে চশমাটি লাগানো যাচ্ছিল না। এ জন্য চশমা খুলে তাপস হাতে নিয়েছে। তাছাড়া নতুন বর, চোখে চশমা কেমন একটু অড লাগে। ফলে ট্রান্সফার ব্যবস্থা।

কিন্তু বিধি বাম। বিপত্তিটা ঘটলো তখনই যখন পাত্রী পক্ষের একজন তাপসের কাছ থেকে জুতা নেয়ার জন্য জোরে টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাপসের হাত থেকে চশমাটি পড়ে সোজা কারো পদতলে স্থান নিল। ফলে যা হবার তাই হলো।

বেচারা বর ঘটনা শুনে হতাশ হয়ে গেল। পাচ বছর প্রেম করে ঘরে বৌ আনা হচ্ছে, অথচ আজ রাতে ভালো করে একটু দেখা হবে না। এ দুঃখ সহ্য করা যায়? বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে এসে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সম্ভব হলো না। লিটনকে আশ্বাস দিলাম, হতাশ হবে না বন্ধু, *সবুরে মেওয়া ফলে*। নিজেরই জিনিস, একদিন পরেই না হয় দেখলে। আজ রাতটা কোনো রকম ধার না নিয়েই...।

পরদিন বৌভাত। তাই ওকে চশমা এনে দিতেই হবে। যাহোক, এক পরিচিত বন্ধুর সহায়তায় অন্তত লিটনকে বৌভাতের রাতে চশমা দিতে পেরেছি। আশা করি, সেদিনের রাতে সে দেখে শুনেই সব কিছু...।

কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা থেকে

সোনার চেয়ে দামি

– পারভেজ বাবুল

বড় বোনের বিয়ে ঠিক হলো। বর প্রবাসী। স্কুল মাস্টার বাবার জমানো কোনো টাকাই ছিল না। মামা এবং আত্মীয়স্বজনদের সহযোগিতায় প্রায় লাখ দেড়েক টাকা খরচ করে বড় আপাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হলো।

বিয়ের প্রায় তিন মাসের মাথায় একদিন দুলাভাইসহ আপা এলেন। বুঝতে পারতাম আমরা গরিব বিধায় দুলাভাই এবং তার আত্মীয়স্বজনেরা আমাদেরকে খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। বিয়ের সময় কোন কোন জিনিস দেয়া হয়নি সেগুলো উল্লেখ করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আপাকে পরোক্ষভাবে তাগিদ দিতেন যেন সেগুলো দেয়া হয়। দুলাভাইকে মা বাবা বোঝাতেন, বাবা, তোমাকে দিতে ইচ্ছে করে অনেক কিছুই। কিন্তু আমাদের দেয়ার সাধ্য নেই। তাই মন খারাপ করো না, অঞ্জনাকেও কষ্ট দিও না। ওর কোনো দোষ নেই। দোষ আমাদের কপালের। কারণ আমরা গরিব। তবে গরিবের দোয়া যদি কাজে আসে সেটা দিতে পারবো। দুলাভাই কিছু না বলে চুপ করে থাকতেন। শ্বশুরবাড়ির জিনিসের প্রতি তার যে লোভ আছে, চেহারা দেখে বোঝা যেতো।

যাহোক, আমরা আদর-আপ্যায়ন আর ভালোবাসা দিয়ে দুলাভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, যৌতুকের চেয়ে বৌ এবং শ্বশুরবাড়ি মানুষের, শ্যালক-শ্যালিকার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা বেশি দামি বা সম্মানের।

আমাদের বাড়ি আসার পরদিন দুভার্গ্যক্রমে দুলাভাই-এর সোনালি ফ্রেমের চশমাটা হারিয়ে গেল। বাড়ির ছোট-বড় সবাই ইন্নালিল্লাহ পড়লাম আর চশমাটা খুজলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না।

দুলাভাই রাগ করে বাড়ি চলে গেলেন আপাকে রেখে।

আমরা এবং মুরুব্বিরা অনেক অনুরোধ করে, বুঝিয়েও তাকে রাখতে ব্যর্থ হলাম।

তার একটাই কথা, শ্বশুরবাড়ির লোকজন চোর এ কথা জানলে তিনি আমার বোনকে বিয়ে করতেন না।

তার কথা শুনে রাগ হলেও বোনের কথা ভেবে চুপ করে রইলাম।

পরদিন বাবা এবং ছোট মামা গেলেন দুলাভাইকে আনতে। তিনি তো এলেনই না, বরং অপমানজনক এবং অশালীন বেশ কিছু কথা বলেছেন যেগুলো শুনে বাবা চোখের পানি আটকে রাখতে পারেননি।

ছোট মামা বলেছিলেন, হারানো চশমার মতোই সোনালি ফ্রেমের চশমা বানিয়ে দেবো, চলো।

তাতেও কাজ হয়নি। দুলাভাইয়ের একটাই কথা, আমরা চোর।

মাস খানেক পরে শুনলাম দুলাভাই বিদেশে চলে গেছেন। তার সপ্তাহ খানেক পরেই আপার কাছে তালাকনামা এলো ডাক মারফতে। সেই থেকে আপার কান্না আর কষ্টের শুরু।

কয়েকদিন পরে মা পুকুরঘাটে যাওয়ার পথে চিৎকার করে সবাইকে ডাকলেন।

আমরা যে যেখানে ছিলাম দৌড়ে গেলাম। দেখি ইদুরের গর্তের মুখে সেই হারানো ফ্রেমের চশমা। তুলে আনলাম। বাম পাশের গ্লাসটা ভাঙা। সম্ভবত কোনো কিছুর চাপ লেগেছিল।

আপা কাদতে শুরু করলেন।

ওইদিন দুলাভাইদের বাড়িতে মোবাইলে ফোন করে বললাম চশমাটা নিয়ে যেতে।

ভাবলাম এবার হয়তো আপার কষ্ট শেষ হবে।

দুলাভাইয়ের এক আত্মীয় এসে চশমাটা নিয়ে গেলেন। কিন্তু আপাকে কেউ নিতে এলো না।

শুনেছি দুলাভাই বিদেশে দ্বিতীয় বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। দুলাভাইকে বলতে ইচ্ছে করে, আমার বোনের কষ্ট আর চোখের প্রতি ফোটা পানি আপনার সোনালি ফ্রেমের চশমার চেয়েও অনেক দামি। কারণ চশমার চেয়ে মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি। চশমা সোনার হলেই বা কি? মানুষ তো সোনা অথবা হীরার চেয়েও দামি। তবে দুলাভাই-এর মতো নিচুমনা, যৌতুক লোভী, বিবেক বর্জিত মানুষের দাম লোহার ফ্রেমের চেয়েও কম, নয় কি?

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

parvezbabul@hotmail.com

সম্পর্ক

যখন ঢাকায় পড়তাম তখন ভাই–ভাবীদের সঙ্গে থাকতাম। একই বাসায় থাকার সমস্যার কারণে কিছুদিন পর আমি আলাদা একটা বাসায় বন্ধুদের সঙ্গে থাকা শুরু করি। ভাইও অন্য একটা বাসায় আরো দুই ফ্যামিলির সঙ্গে থাকা শুরু করেন। আমার বাসা থেকে অল্প কিছু দূরে ভাবীদের বাসা। ভাতিজাকে দেখার সূত্রে নিয়মিত সেখানে যাতায়াত শুরু করি।

সেই বাসার অন্য ফ্যামিলির এক মহিলাকে ভাই ভাবীর সূত্রে আন্টি ডাকা শুরু করি।

আন্টির বিয়ে হয়েছে প্রায় পনেরো ষোল বছর। কিন্তু কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সেই বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করাতে এবং আন্টির কিছু হেলপ করাতে তার অনেকটা আপন হয়ে যাই।

একদিন বাড়ি আসার সময় বাসায় কেউ না থাকায় আন্টি আমাকে অনেকগুলো চুমু খান।

আমিও দুই তিনটা চুমু দিয়ে চলে আসি।

তারপর যখন আবার ঢাকাতে ফিরে যাই, একদিন খুব সকালে আন্টিদের বাসায় গিয়ে দেখি বাসার সবাই ঘুমাচ্ছে। আংকল বাইরে গেছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আন্টি জেগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেন।

আমিও আন্টির ঠোঁট, মুখ সব কিছু চুষতে থাকি। আমার হাত তার সারা শরীর ঘুরে বেড়ায়। আন্টি কিছুই বলেন না।

এক পর্যায়ে তার ব্লাউজ, ব্রা খুলে বাতাবি লেবু সাইজের দুটি নিয়ে খেলা শুরু করি। দীর্ঘক্ষণ ছিলাম। সে এক অসাধারণ অনুভূতি। আন্টির সঙ্গে এভাবেই মাঝে মধ্যে হতো। আন্টির সমস্ত শরীরেই আমার স্পর্শ আছে। কিন্তু একটা কাজই তিনি আমাকে কখনোই করতে দেননি। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন কাজটি।

আন্টি এখনো আমাকে ভালোবাসেন। একবার আন্টি তাদের বাড়ি গেলে আমিও সঙ্গে যাই। আন্টি আমাকে একটা আংটি উপহার দেন। তারপর আবার ঢাকা গেলে আন্টি নিজে থেকে আমার কাছে একটা চশমার কথা বলেন।

তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে চলে আসবো। কি আর করা! আন্টিকে তিনশ টাকা দিয়ে ইস্টার্ন প্লাজা থেকে কিনতে বলে চলে এলাম।

কিছু দিন পরে আবার যখন গেলাম তখন দেখি আন্টি পঞ্চাশ ষাট টাকা দামের একটা চশমা তিনশ টাকা দিয়ে নিউ মার্কেটের সামনে ফুটপাথ থেকে কিনেছেন। ব্যাপারটা যখনই মনে পড়ে খুব হাসি পায়।

আজ আন্টি থেকে আমি অনেক দূরে। তবুও আন্টিকে খুব মনে পড়ে। মাঝে মধ্যে সেই বাসায় যাই। কিন্তু আন্টি আমাকে আর আগের মতো আদর করেন না, আদর করতেও দেন না। তবুও আন্টিকে খুব ভালোবাসি।

নাম ঠিকানা বিহীন

বাবা

– আয়ুব মুহাম্মদ

এক.

আমরা চার ভাই, এক বোন। আমি সবার ছোট। আমার বাবাকে ভয় পেতো না এমন দুঃসাহস কারো দেখিনি। আব্বা যতোক্ষণ ঘরে থাকতেন ততোক্ষণ আমাদের বিরতিহীন পড়তে হতো। আব্বা সকাল সাতটার দিকে বের হলে তারপর আমাদের স্বস্তি। অবশ্য আম্মাও কম যান না। তবে আব্বার ভয়ের মধ্যে বড় হয়েছি। তার ফল অত্যন্ত মধুর। বলতে গেলে আমরা চার ভাই সবাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী।

আব্বা খুব রাগী হলেও আমার মামিরা খুব মজা করতেন। একদিন আমার মেজ মামিকে আব্বা এমন মজার কথা বললেন যা আমার এখনো মনে পড়লে হাসি পায়।

আব্বার বন্ধু–বান্ধব অধিকাংশের দাড়ি ছিল। দারুল ইসলাম (আমেনার বাপ) ছিলেন আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে দাড়িতে এতো সুন্দর লাগতো তা বলার মতো না। কিন্তু পয়ষট্টি বছর বয়স পার হলেও আব্বার দাড়ি রাখার নাম নেই। অনেকে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তিনি সব সময় ক্লিন শেভ করে হাফ শার্ট পরতেন। মাঝে মধ্যে পাঞ্জাবি, চুলে কলপ ইত্যাদি। আমার আম্মা, মামা–মামিরা সবাই আব্বাকে কতো করে বোঝালেন। কিন্তু দাড়ি না রাখার ব্যাপারে তিনি অনড়।

এদিকে বড়দা–র বিয়ে প্রায়ই সন্নিকটে। এর কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম এলেন চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য। তিনি আবার চোখ দেখানোর জন্য পাহাড়তলি চক্ষু হাসপাতাল ছাড়া কোথাও যেতেন না। যথারীতি ওনাকে আমি নিয়ে গেলাম।

ডাক্তার চোখ দেখে চশমা প্রেসক্রাইব করলেন।

শহরের লালদীঘির পাড়ে জান অপটিকস সবচেয়ে পুরনো চশমার দোকান। জান অপটিকস–এর চশমা আব্বা ব্যবহার করেছেন সারা জীবন। সম্ভবত ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে জান অপটিকসে নিয়ে গেলাম আব্বাকে চশমা কেনার জন্য।

আব্বার চেহারা দেখে দোকানের এক কর্মচারী বললো, আদাব আংকল। ভেতরে আসেন।

এ কথা শোনার পর সম্ভবত আব্বা খুব লজ্জা ও অপমান বোধ করলেন।

আমিও ঠায় দাড়িয়ে আছি। এরপর থেকে বাবা আর দাড়ি ফেলেননি। কি সুন্দর দাড়ি রেখেছিলেন আব্বা তা বলার মতো না। আমার মা, মামা–মামি কাউকে আর ঠাট্টা করতে দেখিনি। কেমন জানি খুব বয়স্ক হয়ে গেলেন হঠাৎ করে।

আব্বার দাড়ি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমরা চার ভাই সবাই পালাক্রমে বাড়িতে গিয়েছিলাম। ২০০১ সালের ২৪ মে ভোর রাতে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে বাবা মারা যান। ছোট ছেলে হিসেবে আমার সে কষ্টের স্মৃতি এখনো আমাকে কাদায়। বাবার জীবনের এমন একটা টার্নিং পয়েন্টে আমি ছিলাম। আমি ওই দিন চশমার দোকানে না থাকলে হয়তো বাবা দাড়ি রাখতেন না।

দুই.

১৯৯৩ সালে আমরা ষোলজন বন্ধু হাজি মুহাম্মদ মহসীন কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক রুহুল আমিন–স্যারের কাছে পড়তে যেতাম। স্যারের বাড়ি নোয়াখালি হওয়ায় আমরা খুব মজা করতাম। কি পরিমাণ স্যার আমাদের স্নেহ করতেন তা বলার মতো না।

আমাদের ব্যাচে দুজন মেয়ে পড়তো যাদের নাম দিয়েছি *চিতাবাঘ* ও *কালো বিড়াল*।

স্যার শুনেও কিছু বললেন না, বরং ওই মেয়ে দুটোকে আরো উত্তেজিত করলেন।

যাক, আমরা ১৯৯৩ সালের রমজানের কোনো এক বিকেলে পড়তে গেলাম। স্যার রোজা রাখায় খুব ক্লান্ত। আমি আর সরোজ দুষ্টামি করতে গিয়ে স্যারের চশমা পড়ে গেল এবং দুই টুকরো। স্যার কি বকা দিলেন। এবং ওই দিন আর পড়াতে পারেননি। এমন কষ্ট কোথায় রাখি।

এক সপ্তাহ পড়তে গেলাম না। স্যার পরে আমাদেরকে খবর দিলেন। আবার পড়তে লাগলাম।

যেদিন আমাদের কোচিং শেষ সেদিন স্যারের কি কান্না! বললেন, এমন দুষ্ট ছেলে আমার ছাত্র জীবনেও দেখিনি। তোরা সবাই ইনশাআল্লাহ মানুষ হবি।

স্যারের দোয়া হয়তো বাস্তব হবে। আমাদের মতো অকৃতজ্ঞ ছাত্ররা স্যারকে কখনো দেখতেও যাইনি। সিডিএ সাতাশ নাম্বার ও সতেরো নাম্বার রোডে আমি পড়াই। অথচ দশ গজ দূরে তিন নাম্বার রোডের কেয়াকুঞ্জ–এ কখনো যাইনি। ছিঃ! এ চিঠি যদি স্যার পড়েন তাহলে ক্ষমা করবেন। হয়তো একদিন দেখতে যাবো, যেদিন ওই চশমা ভাঙার স্মৃতি স্যার ভুলে যাবেন।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

হারানো নাম

– দ্বীন মোহাম্মদ

নোয়াখালীর চৌমুহনী এসএ কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা দেবো। পরীক্ষার আর কয়েক মাস বাকি। অন্যান্য বিষয়ের প্রস্তুতি ভালো থাকলেও ইংরেজির জন্য তেমন প্রস্তুতি ছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম পরীক্ষার আর যে কয়েক মাস আছে সে কয়েক মাস ইংরেজি প্রাইভেট পড়বো।

কলেজের ইংরেজি শিক্ষক কাশেমস্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। স্যার বললেন, ব্যাচ ঠিক করে আসো।

স্যার আবার এক ব্যাচে বিশজনের কমে পড়ান না। রুবেল, মতিন, আনোয়ার, মাহফুজসহ অন্য ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ঊনিশজনের একটা দল নিয়ে প্রাইভেট পড়া শুরু করলাম।

চার পাচ দিন পড়ার পর আমাদের সঙ্গে অন্য কলেজের একটি ছাত্র যোগ দেয়। ছেলেটি মোটা, ভারী লেন্সের চশমা পরতো।

স্যারের রুমে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা বসার ব্যবস্থা। চশমা পরা ছেলেটি প্রায় সময় দেরি করে আসতো। ছেলেদের বসার স্থানে জায়গা থাকতো না বলে স্যার তাকে মেয়েদের সঙ্গে বসতে দিতেন।

ছেলেটি আমাদের সঙ্গে তেমন কোনো কথা বলতো না। সারাক্ষণ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতো। ব্যাচের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে নার্গিসের সঙ্গে একটা কথা বলতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আর ওই চশমাওয়ালা অবলীলায় হাসি হাসি মুখে নার্গিসের সঙ্গে কথা বলে।

ব্যাপারটা অন্যরা মেনে নিলেও বন্ধু রুবেল ও আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।

একদিন প্রাইভেটে আসতে দেরি হয়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি হাটছি। হঠাৎ দেখি চশমাওয়ালা ছেলেটি কলেজ রোডের একটি দোকানে বসে বসে টিভি দেখছে। এদিকে প্রাইভেটের সময় চলে যাচ্ছে।

আমি স্যারের রুমে ঢোকার প্রায় মিনিট দশেক পর সে রুমে ঢোকে।

বুঝতে আর বাকি রইলো না। ছেলেটি ইচ্ছে করেই দেরি করে আসে যাতে মেয়েদের সঙ্গে বসতে পারে।

ঘটনাটা রুবেলকে বললাম।

সে বললো ব্যাপারটা সেও লক্ষ্য করেছে।

ঠিক করলাম ছেলেটিকে নাজেহাল করবো। রুবেলসহ যুক্তি করে ছেলেটির নাম দিলাম *চশমুদ্দিন।* ব্যাচের অন্যদেরকেও ছেলেটির দেরিতে আসার রহস্যটা বললাম। এবং সবাই যাতে তাকে চশমুদ্দিন বলে ডাকে তাও বলে দিলাম।

শুরু হলো ছেলেটিকে জ্বালাতন। এই চশমুদ্দিন, কি খবর? এই চশমুদ্দিন, কই যাও?

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চশমুদ্দিন বলে ডাকতাম। এক পর্যায়ে চশমুদ্দিন নামটা স্যারের কানে গেলে তিনিও এই নামে ডাকা শুরু করলেন।

কয়েকদিন পর চশমুদ্দিন আমার হাত ধরে কাতর স্বরে বললো, ভাই আমি কি অপরাধ করেছি যার কারণে আমার নামটা পাল্টে দিলে।

বললাম, তোমার অপরাধ, তুমি ইচ্ছে করে দেরিতে আসো যাতে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারো।

ও অপরাধ স্বীকার করে বললো, আমি আর দেরি করবো না। তুমি অন্যদের বলে দাও যাতে কেউ আমাকে চশমুদ্দিন বলে না ডাকে।

বললাম, ঠিক আছে, বিনিময়ে আমাকে আর রুবেলকে একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়াতে হবে।

সে রাজি হলো।

ছেলেটি তার প্রতিশ্রুতি পালন করলেও আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারিনি। শত চেষ্টা করেও চশমুদ্দিন নামটা অন্যদের মুখ থেকে মুছতে পারিনি। চশমুদ্দিন নামের আড়ালে তার পিতৃ প্রদত্ত নামটা হারিয়ে যায়।

খিলগাও, ঢাকা

গহনা

– অমিত আহসান

ভোর রাতে সীমার ফোনে ঘুম ভাঙার পর আর ঘুমাতে যায়নি রঞ্জন। আজ তাদের প্রথম ডেট। নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে এ ভেবেই সে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। রঙচটা পাঞ্জাবিটা বাদ দিয়ে আজ একটা ব্রাইট টি–শার্ট পরলে কেমন হয়। বাড়িতে একটা ভালো কোলোন পর্যন্ত নেই। কি যে করি! রঞ্জন অস্থির হয়ে পায়চারী করতে থাকে।

রঞ্জনটা আসলে খুবই শাদা–মাটা জীবনে অভ্যস্ত। সীমা যে কি ভেবে তার আহ্বানে সাড়া দিল সেটাই সে ভাবছে। মাত্র কিছু দিন আগে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ডিবেট কমপিটিশনে সীমার সঙ্গে তার পরিচয়। সীমার স্ট্রাইকিং চেহারা আর ফিগার সুবোধ বালক রঞ্জনের চোখও সেদিন এড়ায়নি। তার অবশ্য একটা সুবিধা আছে। মোটা ফ্রেমের চশমার আড়াল।

কমপিটিশনে হেরে যাবার পর অন্যদের সঙ্গে সে সীমাদের দলকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছিল, তোমার যুক্তিগুলো এবং সেগুলোর উপস্থাপন খুবই চমৎকার হয়েছে। তাছাড়া তোমার তো আবার একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ আছে। বিচারকরা আগেই ঘায়েল।

কি বলতে চাও তুমি? সীমা উল্টো প্রশ্ন করেছিল।

এটা একটা কমপ্লিমেন্ট। সুন্দরী মেয়েদের গুণাগুণ নিয়ে আমার সব সময় একটা অন্য রকম ধারণা ছিল। তুমি ব্যতিক্রম।

তোমাকে থ্যাংক ইউ দেবো কি না বুঝতে পারছি না। চশমার ভেতর দিয়ে তো ভালোই দেখতে পান পণ্ডিতমশাই। সীমার চোখেমুখে টিপ্পনি স্পষ্ট।

সেদিন কথাবার্তা আর বেশি দূর এগোয়নি। এরপর ডিবেটিং ক্লাবে প্রায়ই চোখচোখি হতো যদিও সীমার অগুণতি অ্যাডমায়ারারদের ঠেলে এগিয়ে যাওয়া রঞ্জনের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। অন্য ছেলেগুলোর চলন–বলনের স্মার্টনেসে রঞ্জনের রীতিমতো হিংসে হতো। একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করলেও রঞ্জনের মনের মধ্যে সীমা নামটি ঝড় তুলে ফেললো। শয়নে–স্বপনে সে শুধু তাকেই ভাবতে থাকে।

টেলিপ্যাথিতে একদিন কাজ হলো।

মধুর ক্যান্টিনে সীমাই এগিয়ে এসে বললো, কি ব্যাপার পণ্ডিতমশাই, আজ ক্লাস নেই কোনো?

না, নেই। তোমার?

আমার ছিল। এই শেষ হলো। চলো আড্ডা মারি কিছুক্ষণ।

রঞ্জন ভাবলো, বাহ! মেঘ না চাইতেই জল। সে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, এতো আমার সৌভাগ্য।

ফ্লার্ট করছো?

মোটেই না। তুমিও ভালো করে জানো যে, ইউনিভার্সিটির অর্ধেক ছেলে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য হা হয়ে থাকে।

হ্যা থাকে। তাই তাদের সঙ্গে আমার কথা বলতে রুচি হয় না।

প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য রঞ্জন হাতের বইটি এগিয়ে দিয়ে বললো, এটা পড়েছো?

হুমায়ুন আজাদের *পাক সার জমিন সাদ বাদ?* না পড়িনি। তবে শুনেছি, প্রচুর ভালগার কথাবার্তা আছে এতে।

হ্যা আছে। তবে খুবই শক্তিশালী লেখা বলে সেগুলোকে আর ভালগার মনে হয় না। স্যারের সাহসের তারিফ করতে হয়। এটা পড়ে দেখো। অন্যের কাছ থেকে না শুনে নিজে পড়ে বিচার করাই ভালো।

থ্যাংক ইউ। পড়া শেষে হলে তোমার সঙ্গে এটা নিয়ে আলাপ করবো। আজ উঠি। বন্ধুদের সঙ্গে ব্যাচেলর দেখতে যাবো। তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই?

হ্যা দেখেছি টিভিতে।

আমিও। তবে হলে দেখার মজাই আলাদা, তাই না?

তা ঠিক। তাহলে আবার কবে দেখা হচ্ছে?

দেখা তো হতেই হবে। তোমার বইটা ফেরত দিতে হবে না?

ও হ্যা। আমার সেল নাম্বারটা ভেতরে লেখা আছে। পড়া হয়ে গেলে একটা ফোন দিলেই ডিপার্টমেন্টে এসে কালেক্ট করে নেবো।

সেটার প্রয়োজন হবে না। আমিই তোমাকে খুজে নেবো। সীমা উঠে পড়ে।

সেদিনের সেই আলাপের পর রঞ্জন যেন তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। সে উৎসাহিত হয় একটা সম্পর্ক গড়ার জন্য। দেখা যাক কি আছে এই পণ্ডিতমশাইয়ের কপালে! সে মনে মনে বলে।

পরের সপ্তাহটা রঞ্জনের ঘরে বসে কাটাতে হয় এক বিশ্রী ভাইরাস জ্বরের কারণে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুধু সীমাকে নিয়েই সব কল্পনার ফানুস ওড়ায়। মনে মনে ঠিক করে যে, ব্যাপারটা সীমাকে জানাবে এবং যতো শিগগিরই সম্ভব।

এদিকে একটা সপ্তাহ চলে গেল, অথচ মেয়েটা একটা ফোনও করলো না। রঞ্জন আশাহত হয়। সুস্থ হবার পর প্রথম দিনই ক্লাসের পর সে সীমার খোজ করে। ডিপার্টমেন্টে না পেয়ে লাইব্রেরিতে যায়। গিয়ে দেখে সীমা তার ক্লাসের আরো দুটো ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। রঞ্জন এগিয়ে বলে, কেমন আছো সীমা?

আরে, পণ্ডিতমশাই, খবর কি তোমার? আই অ্যাম রিয়ালি সরি, তোমার বইটা ফেরত দেয়া হয়নি। কালই এনে দেবো।

না, না, ঠিক আছে। আমিও সপ্তাহ খানেক ইউনিভার্সিটি আসিনি। আজ ভাবলাম তোমার একটু খোজ করি। আর হ্যা, তোমার জন্য আরেকটা বই এনেছিলাম। পড়বে?

হ্যা, নিশ্চয়ই।

তাহলে তো ভালোই হলো। আজ চলি।

সীমাকে বইটি দিয়ে রঞ্জন আর অপেক্ষা করে না। ভেতরে ভেতরে সে বেশ নার্ভাস। কারণ বইটির ভেতরে সে কিছু কথা কোট করেছে সীমার উদ্দেশ্যে।

রাতে শোবার সময় বইটির কাভার ওলটাতেই সীমার চোখে পড়ে রঞ্জনের সুন্দর হাতের লেখায় –

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসর পাইলে বাসিও,
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি –

তোমার যখন মনে পড়ে, আসিও।

সারা রাত সীমা ঘুমায় না। এ জীবনে বহুবার বহুভাবে প্রেম নিবেদন এসেছে। কিন্তু রঞ্জনের সহজ–সরল আর সৎ অভিব্যক্তি ওকে ভাবিয়ে তোলে। ছেলেটি অন্য সবার মতো নয়, একদম আলাদা। সীমা তার সারা শরীরে একটা অপরিচিত শিহরণ অনুভব করে। রঞ্জনই বোধহয় জিতে গেল।

সীমা ভোর না হতেই রঞ্জনকে ফোন করে।

কি, কাকভোরে পণ্ডিতমশাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মহা বিরক্ত করলাম নিশ্চয়ই?

কি যে বলো? স্বপ্ন দেখছি না তো?

না, না, স্বপ্ন নয়। আমি সীমা। আজ সমস্ত ক্লাস ফাকি দিয়ে সারাটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই।

অবিশ্বাস্য আর অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাবে রঞ্জন ভাষা হারিয়ে ফেলে। কি বলবে সে বুঝে উঠতে পারে না।

কি হলো, তুমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়লে?

আরে না, কোথায় যাবে বলো।

আমি কি জানি। যেখানে তোমার খুশি।

ঠিক এগারোটায় দেখা হবে অপরাজেয় বাংলার সামনে।

সেখানে তো প্রতিদিনই একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। তুমি বরং আমাকে টিএসসি–র সামনে থেকে পিক করো।

ওকে, সি ইউ এট ইলেভেন। বাই।

বাই।

রঞ্জন শেভ করে শাওয়ার নিয়ে ফিট–ফাট হয়ে আয়নার সামনে খুব মনোযোগ দিয়ে নিজেকে দেখছিল আর ভাবছিল, হায়রে, প্রেমে পড়লে কি মানুষের এই অবস্থা হয়! হঠাৎ করে আয়নায় নিজের চশমাটা নজরে এলো। বড্ড আনস্মার্ট এই চশমাটা। রঞ্জন ভাবে, এটার জন্যই তাকে কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়। এটাকে আজই বিদায় করতে হবে।

বাড়ি থেকে বেড়িয়ে রঞ্জন সোজা গেল এলিফ্যান্ট রোডে কন্টাক্ট লেন্সের খোজে। ডাক্তার দেখিয়ে কন্টাক্ট লেন্স নিয়ে তারপর সে রওনা দেয় টিএসসির উদ্দেশ্যে। চোখে একটু খচখচ করলেও নিজেকে অনেক সপ্রতিভ আর স্মার্ট লাগছে ভেবে আজ সে খবুই আনন্দিত।

টিএসসির সামনে সীমাকে দেখা গেল বার বার ঘড়ি দেখছে। রঞ্জনকে আসতে দেখেই সে বললো। এতো দেরি করলে কেন?

সরি সীমা, রাস্তায় আজ অনেক জ্যাম ছিল।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে দেখতে এ রকম লাগছে কেন? ও বুঝেছি, ভুল করে চশমা ফেলে এসেছো?

সে কথা পরে বলছি। আগে চলো বেরিয়ে পড়ি। ক্যাব দাড় করিয়ে রেখেছি।

ক্যাব ছুটে চলছে। রঞ্জন আর সীমা বিভিন্ন বিষয়ে অনেকটা খাপছাড়া কথা বার্তা বলে চলেছে। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে কার না অস্বস্তি লাগে! গাড়ি এক সময় ওদের গন্তব্যস্থল *চন্দ্রা*–য় এসে থামলো। ততোক্ষণে এক পশলা বৃষ্টির পর বৃষ্টিতে ধোয়া গাছগুলো অপূর্ব সুন্দর লাগছিল।

গাড়ি থেকে নেমে রঞ্জন সীমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলে, চলো জায়গাটা একটু ঘুরে দেখি। আজ ওয়েদারটাও আমাদের ফেভারে আছে। কি, তোমার ভালো লাগছে না?

খুবই ভালো লাগছে। তবে আগে বলো তোমার চশমাটার কি হলো?

আর বলো না। এই চশমা মার্কা চেহারাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। আমি বুঝতাম, এটার জন্যই আমাকে কেমন যেন বেকুব ভাবে সবাই। এমনকি তুমিও আমায় ডাকতে পণ্ডিতমশাই। আজ তাই ওটাকে বিদায় করেছি। কন্টাক্ট লেন্স নিয়েছি। কি, ভালো করিনি?

না, মোটেই ভালো করোনি। আজই তুমি এ কন্টাক্ট লেন্স ফেলে দিয়ে তোমার সেই চশমাটি পরবে। আর কখনো এই চশমা ছাড়বে না আমাকে যদি হারাতে না চাও।

এরপর রঞ্জনকে অনেকটা অবাক করে দিয়েই সীমা দুই হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে আর বলে, বেকুব কোথাকার, এটা শুধু তোমার চশমাই নয়, এটা তোমার গহনাও!

amit_ahsan@yahoo.com

হরিষে বিষাদ

– মৌমীতা আনোয়ার পান্না

চশমা চোখের বডিগার্ড। চশমা যে কোনো বাহ্যিক আঘাত, ধুলা বালি, সূর্যতাপ থেকে চোখকে রক্ষা করে। তারপরও তিন অক্ষরের চশমা শৈশব থেকেই আমার চোখের বালি।

চশমা পরা কাউকে দেখলেই আমার বিরক্তি লাগতো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণে ডাক্তারের পরামর্শে সেই চশমাই আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে গেল।

তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্রী। একদিন মাথার ডান পাশে অল্প অল্প ব্যথা অনুভব করলাম। এভাবে কিছু দিন পর হঠাৎ মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। ক্রমেই ব্যথা সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে লাগলো। চিৎকার, চেচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুললাম।

স্থানীয় চিকিৎসায় ব্যথার উপশম হলো না বিধায় ঢাকা গৃন রোডে এক ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম।

তিনি পরীক্ষা করে বললেন, চশমা নিতে হবে।

সেই থেকেই চশমা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে গেল। কিছু দিন পর পর আমাকে নিউ মার্কেটে *আখি অপটিকস*-এ যেতে হতো।

একদিন পরিকল্পনা মতো আমি, রোকনভাই এবং আনুভাইসহ যশোর চৌগাছা গেলাম ফুপুর বাড়ি বেড়াতে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় কপোতাক্ষ নদের পাড়ে বেড়ালাম। আমার প্রিয় তার লেখা কবিতা আবৃত্তি করলাম।

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমারই কথা ভাবি এ বিরলে।

আমার জীবনে আনন্দময় কিছুটা সময় অতীত করে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য চশমাটা টেবিলের ওপর রাখলাম।

অমনি আমার ফুপাতো ভাই লাফ দিয়ে চশমার ওপর বসলো।

আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, আমার চশমা!

ততোক্ষণে যা হওয়ার তা-ই হলো। আমার চশমাও ভাঙলো এবং আনুভাইয়ের পশ্চাৎদেশে রক্ত দেখা গেল। তিনি বললেন, এটা তোর চশমা রাখার জায়গা?

বললাম, আশ্চর্য! এটা তোমার বসার জায়গা? তুমি নিউটন-এর থার্ড ল' জানো না? প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তুমি আমার চশমা ভেঙেছো, চশমা তোমার বেজায়গা কেটেছে হা হা হা।

হরিষে বিষাদে আবিষ্ট হলাম।

দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

সেই লোকটি

– মোহাম্মদ আকবর হোসেন মুন্না

২০০২ সালের জুন মাস।

বাসা থেকে রাগ করে বেরিয়ে এলাম। বাসে করে চলে এলাম শ্রীমঙ্গলে। মাত্র কুড়ি টাকা নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়েছি। বাস ভাড়ায় চলে গেল দশ টাকা। আরো পাচ টাকা চলে গেল রিকশা ভাড়ায়। রেল স্টেশনে চলে এলাম।

এখন কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে উপায় মনে পড়লো। স্টেশনের কাছেই আমার খালার বাসা। সেখানে চলে গেলাম।

খালা বললেন, কি রে, তুই এতো রাতে কোথা থেকে?

বললাম, স্টেশনে *সেবা প্রকাশনী*–র রিপৃন্ট বই কিনতে এসেছিলাম। খালাকে বললাম, খালা, আরো কিছু বই কেনার বাকি রয়ে গেছে। কিছু টাকা দরকার।

খালা বললেন, টাকা দেয়া যাবে। কিন্তু তুই রাতে কোথায় যাবি, আজ থেকে যা।

বললাম, না খালা, বাসায় বলে আসিনি, চিন্তা করবে।

ঠিক আছে খেয়ে যা, হুকুম করলেন খালা। তারপর বললেন, আমার কাছে দেড়শ টাকা ভাংতি আছে, তোর চলবো?

বললাম, চলবে।

খালার বাসা থেকে বের হয়ে রেল স্টেশনে চলে এলাম। এখন পকেটে সর্বমোট একশ পঞ্চান্ন টাকা। খোজ নিয়ে দেখলাম, *উদয়ন এক্সপ্রেস* দশটা পঞ্চাশ মিনিটে শ্রীমঙ্গলে আসবে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য। এখন বাজে মাত্র আটটা। কাউন্টারে এসে ফেনীর একটা টিকেট কাটলাম। চশমার কারণে লোকটিকে চোখে পড়লো। তিনি কয়েক মিনিট ধরে আমাকে অনুসরণ করছেন। বয়স হবে চল্লিশ–পয়তাল্লিশ।

টিকেটে একশ ত্রিশ টাকা চলে গেল। বাকি পচিশ টাকা থেকে একটা ম্যাগাজিন কিনলাম সাত টাকা দিয়ে। মাত্র ১৮ টাকা এই টাকা দিয়ে ফেনী গিয়ে কি করবো ভেবে পেলাম না।

বেঞ্চে বসে ম্যাগাজিন পড়ছি, সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক। চশমাওয়ালা লোকটি এসে কাছে বসলেন এবং গলা কেশে বললেন, ঘড়ি আছে, কয়টা বাজে?

উত্তর দিলাম, নেই।

লোকটিকে আমার ভালো লাগলো না। শুনেছি রেল বা বাস স্টেশনে দুষ্ট লোকেরা থাকে, তারা লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে এবং টাকা–পয়সা নিয়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে তো তেমন টাকা নেই। মাত্র আঠারো টাকা।

চশমাওয়ালা লোকটি বললেন, আপনাকে একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না।

বললাম, আমি আপনার অনেক ছোট, আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি মাত্র এসএসসি দিয়েছি। এবার বলেন কি বলবেন।

কোথায় যাবেন?

ফেনী।

আপনার বাড়ি কোথায়?

মৌলভীবাজার।

সেখানে কোথায়?

ফরেস্ট অফিস রোড।

লোকটি আমতা আমতা করে বললেন, বাড়ি থেকে রাগ করে এসেছেন বুঝি?

মনে মনে বললাম, লোকটি বুঝলো কিভাবে! নিশ্চয়ই আমি একা ও হাতে কোনো ব্যাগ নেই দেখে। আমি উত্তর দিলাম না।

লোকটি হেসে উত্তর দিলেন, আমি যখন আপনার মতো ছিলাম, কয়েকবার রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। বাইরে বের হয়ে বুঝেছি পৃথিবী কতো কঠিন জায়গা। টাকা ছাড়া এক মুঠো ভাত কেউ দেবে না। কাজ করে খেতে হয়। তারচেয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও। বাবা মা যা করেন, সন্তানের ভালোর জন্য করেন। তারা নিশ্চয়ই তোমার জন্য চিন্তা করছেন। হয়তো খুজতে বের হয়ে গেছেন।

ভেবে দেখলাম লোকটির কথাই ঠিক। ফেনী গিয়ে কি করবো, একমাত্র মাটি কাটা ছাড়া আর কিছু পারবো না। বাবা–মা লেখাপড়ার জন্য কোনো কাজ করতে দেননি।

বাসায় রাত বারোটায় এলাম। এবং আজও সব সময় আমার চশমাওয়ালা লোকটির কথা মনে পড়ে।

মৌলভীবাজার থেকে

অপারেশন

– মোহাম্মদ হারুন–অর–রশিদ

মোটা ফ্রেমের কালো চশমা পরে আছেন তিনি। অনেক কষ্ট, অনেক বেদনাকে ঢেকে রেখেছেন তিনি এই কালো চশমা দিয়ে। এই চশমা সাধারণত চোখের অপারেশনের পর চোখের ডাক্তাররা পরার উপদেশ দেন। তিনিও এই চশমা পরে আছেন চোখের অপারেশনের পর। তার নিজের চোখের নিরাপত্তার জন্যই শুধু নয়, আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার লজ্জাকেও তিনি ঢেকে রেখেছেন এই মোটা ফ্রেমের কালো চশমা দিয়ে।

তিনি আমার আত্মীয়া। আমার মা তুল্য শ্বাশুড়ি। চোখে কম দেখা শুরু করলেন। চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখানো হলো।

ডাক্তার বললেন, চোখে ছানি পড়েছে। যতোদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি অপারেশন করাতে হবে।

আমার শাশুড়ির বোনের ছেলেমেয়েরা ঢাকা মেডিকাল কলেজের এম.বি.বি.এস–এর স্টুডেন্ট। খালার অপারেশন করাতে হবে শুনে তারা ঢাকা মেডিকালের চক্ষু বিভাগের প্রধান চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

তিনি রোগী দেখে ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিলেন।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা করিয়ে অপারেশনের দিনক্ষণ ধার্য করলেন। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন হলো। অপারেশনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পেশেন্টের চোখে প্রচণ্ড ব্যথা এবং রক্তপাত শুরু হলো। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তাররা বিভিন্ন রকম ওষুধ প্রয়োগ করেও পেইন ম্যানেজ করতে পারলেন না এবং রক্তপাতও পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না।

সাত আট দিন চিকিৎসার পরও ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞরা রোগীর তেমন উন্নতি করতে পারলেন না। অবশেষে তারা ঢাকা শহরের আরেকটি প্রাইভেট চক্ষু হাসপাতালে রোগীকে রেফার করলেন সেখানে উন্নত যন্ত্রপাতি আছে বলে।

উক্ত প্রাইভেট হাসপাতালটিতে আরো সপ্তাহ খানেক চিকিৎসা চললো। কিন্তু রোগীর তেমন কোনো উন্নতি হলো না।

পেশেন্টের নিজের ছেলে চট্টগ্রাম মেডিকাল কলেজে এম.বি.বি.এস–এর স্টুডেন্ট। সে সিদ্ধান্ত নিল, মাকে দেশের বাইরে নিতে হবে। আর্থিক সঙ্গতি এবং আরো অনেক কিছু বিবেচনা করে রোগীকে ইনডিয়া নেয়া হলো।

কলকাতায় একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে দেখলেন এবং সল্ট লেকের একটি চক্ষু হাসপাতালের ঠিকানা দিলেন।

উক্ত চক্ষু হাসপাতালে রোগীকে দেখানো হলো।

ওখানকার চক্ষু চিকিৎসকরা রোগীকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, অন্তত সাত দিন আগে আমাদের এখানে এলে কর্ণিয়াটি বাচানো যেতো। রোগীর কর্ণিয়া আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের চিকিৎসায় রোগীর পেইন কমলো। এবং পরবর্তী কালে আর কোনো জটিলতা না হয় সেই চিকিৎসা তারা দিলেন।

আমার শাশুড়ির একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই চোখে তিনি আর কোনো দিন দেখতে পাবেন না পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য।

আমার শাশুড়ির বক্তব্য, হাসপাতালের প্রধান চক্ষু বিশেষজ্ঞ (অধ্যাপক)–এর অবহেলায় অর্থাৎ অপারেশনটি তিনি সম্পূর্ণ না করে অ্যাসিস্টান্টদের কাছে কিছু কাজ রেখে অপারেশন থিয়েটার ছাড়েন এবং এই কারণে তিনি তার কর্ণিয়াটি হারান।

আমার শাশুড়ির বক্তব্য সঠিক–বেঠিক যাই হোক, ডাক্তাররা হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক কথা বলবেন, অনেক যুক্তি দেখাবেন। আমার শাশুড়ি তার চোখটি হারিয়েছেন বা নষ্ট হয়েছে এ দেশের সেরা চক্ষু বিশেষজ্ঞদের হাতে হাসপাতালে চোখের ছানি অপারেশনে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন, আ–মৃত্যু বয়ে বেড়াবেন।

বাকি চোখটির অপারেশন হয়েছে গত বছর ২০০২ সালে। বাংলাদেশে পরবর্তী চোখটি অপারেশনের সাহস বা রিস্ক রোগী এবং রোগীর সংশ্লিষ্ট আত্মীয়স্বজন কেউ নিতে চায়নি কিংবা নেয়নি।

মাদ্রাজের শংকর নেত্রনাল চক্ষু হাসপাতালে তার বাকি চোখটির ছানি অপারেশন হয়। অপারেশনের আগের দিন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। অপারেশনের দিন এবং তার পরের দিন রোগীকে হাসপাতালে রাখা হলো। তারপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তাকে রিলিজ করলো।

মাদ্রাজ থেকে তিনি যখন এলেন, এবারও তার চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা। এবার তিনি উৎফুল্ল, আনন্দিত। মোটা ফ্রেমের কালো চশমা তার আনন্দকে ঢেকে রাখতে পারছেন না। আনন্দের কারণ শংকর নেত্রনাল চক্ষু হাসপাতালে চোখের ছানি অপারেশনে তিনি তার চোখটি হারাননি।

এখন আর তিনি কালো চশমা পরেন না, একটি সাধারণ চশমা পরেন।

খুলনা থেকে

ছবি

– শরিফ উদ্দিন আহমদ

এক বিকেলে শিবলীদের বাসার দোতলায় চোখ পড়তেই চমকে যাই। অসাধারণ এক রূপবতী মেয়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাড়িয়ে। চোখে সানগ্লাস। একরাশ দীঘল কালো চুল পিঠে ছড়িয়ে উদাস ভঙ্গিতে দাড়িয়ে কি যেন ভাবছে। আমি অপলক তাকিয়ে থাকি মেয়েটির দিকে। এমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। ভীষণ ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। মনস্থির করলাম, আজই শিবলীর কাছে জানবো কে এই মেয়ে, কি তার পরিচয়।

সন্ধ্যায় যখন শিবলীদের বাসায় গিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে দুজনে কথা বলছিলাম, পাশের রুম থেকে সরু গলায় গানের সুর ভেসে আসছিল *ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।*

জিজ্ঞাসা করলাম, কে গান গায় রে? চমৎকার কণ্ঠ তো!

শিবলী বলে, শিরিন। তোকে বলেছিলাম না, আমার ছোট খালা কানাডায় থাকে। সেই খালা গতকাল এসেছেন। সেই খালার ছোট মেয়ে শিরিন। খুব ভালো গান গায়। চল তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বলেই শিরিনকে ডাকে।

ঘরের ভেতরেও খুব স্মার্ট হয়ে থাকে শিরিন। বেগুনি সালোয়ার কামিজের সঙ্গে সোনালি ফ্রেমের হালকা সানগ্লাস চমৎকার মানিয়েছে শিরিনকে। সুন্দরী মেয়েরা তাদের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে চায় সব সময়।

পরিচয় পর্ব শেষে জানতে পারলাম তারা এখন দেশেই থেকে যাবে। এবং আগামীকাল তার বার্থডে। আমাকেও নিমন্ত্রণ দিল শিরিন।

বাসায় ফিরে ভাবতে লাগলাম কি গিফট দেয়া যায়? এমন কিছু যা হবে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ, যা দেখার পর শিরিন বিস্মিত হবে। খুশিতে আত্মহারা হবে। হঠাৎ চমৎকার এক আইডিয়া এলো মনে। শিরিনকে প্রথম দেখার দৃশ্যটি আর্ট করে কাচের ফ্রেমে বাধাই করে দেবো।

সে রাতেই আর্ট পেপার, রঙ তুলি নিয়ে এলাম। সারা রাত জেগে আমার সমস্ত মেধা দিয়ে খুব সুন্দর করে জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিটি আকলাম। আমি যে এতো ভালো আর্ট জানি তা আমারও জানা ছিল না। অবশ্যই শিরিনের জন্য এটি হবে এক গ্রেট সারপ্রাইজ। এটা দেখে অবাক হবে, বিস্মিত হবে, আনন্দে আত্মহারা হবে।

বাজারের খুব দামি ফ্রেমে বাধাই করে রঙিন পেপারে মুড়িয়ে নিয়ে বিকেলে হাজির হলাম সেই অনুষ্ঠানে। সবাই ছবি দেখে অবাক। এতো ছবি নয় যেন সত্যি সত্যিই আমাদের শিরিন বারান্দার রেলিং ধরে দাড়িয়ে আছে।

আনন্দমুখর পরিবেশে সবাই যখন ছবি নিয়ে মাতামাতি করছে তখন আন্টির চোখে আবেগে অশ্রু এসে যায়। আন্টি অশ্রু মুছতে মুছতে বলেন, আজ যদি আমার শিরিন এ ছবি দেখতে পেতো তাহলে কি যে খুশি হতো!

শিরিন যে অন্ধ তা জানার সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে আমার হাত থেকে ছবিটি পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

কি হয়েছে, কি হয়েছে বলে শিরিন ড্রয়িংরুমের চকচকে ফ্লোরে পড়ে থাকা কাচের ওপর হুমড়ি খায়।

আমার বুকের ভেতরটাও যেন বজ্রাঘাতে ছবির কাচের ফ্রেমের মতোই টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

পুলিশ মডেল

– আবদুর রহিম

বাবা আমার দাদার সবচেয়ে বড় ছেলে ছিলেন। তাই ছোট বেলার বাউন্ডুলেপনা কৈশোর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। দাদার চোখ রাঙানো এবং উগ্র মেজাজেও তার আদৌ পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এক সময় কর্মের সন্ধানে আবু ধাবি তথা বর্তমান ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এসে পৌছানো। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও সৎ আমার বাবা নিজ প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত একটি দোকান দিলেন যা সমস্ত আবু ধাবি-তে প্রথম ফেনীর কারো দোকান। বৃহত্তর নোয়াখালীর কোনো মানুষের তখনকার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা চাকরি ছাড়া ব্যবসা ছিল না। এবার মূল ঘটনায় আসি।

বাবার খুব শখ ছিল তখনকার বিখ্যাত Police (পুলিশ) মডেল-এর একটি দামি ফ্রেমে বাধানো সানগ্লাস কিনবেন। একদিন কিনেও ফেললেন। চশমার বিপুল সংগ্রহ ছিল বাবার যার থেকে প্রতিনিয়ত কাউকে না কাউকে চশমা উপহার দেয়া তার অভ্যাসে হয়ে দাড়িয়েছিল। সব দিলেও নিজের প্রথম আয়ে কেনা পুলিশ চশমাটি কাউকে ধরতেও দিতেন না যা ছিল তার নিত্যসঙ্গী।

১৯৯৫ সালে দেশে এসে কিছু দিন থেকে যখন প্রবাসে ফেরত যাওয়ার উদ্দেশ্যে রিটার্ন টিকেট রিকনফার্ম করার জন্য ফেনী থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন তখন তার জীবনের চরম দুর্ঘটনা ঘটে। বিরোধী দলের দেয়া হরতাল উপেক্ষা করা ট্রেন চলছিল বলে চট্টগ্রামের পথে কোনো অচেনা জায়গা দিয়ে যখন ট্রেনটি যাচ্ছিল তখন হরতাল সমর্থনকারী দলের কিছু কর্মী হঠাৎ ট্রেনের বগী লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া শুরু করলো। বাবা বসেছিলেন জানালার পাশে। তার চোখে অত্যন্ত প্রিয় সেই পুলিশ সানগ্লাসটি। হঠাৎ একটি বড় মাপের পাথর এসে বাবার চোখে এসে লাগে। চশমাটির কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বাবার চোখের নিচের কিছু অংশ অত্যন্ত বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কেটে যায়। বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

ভাগ্য অত্যন্ত ভালো যে, চট্টগ্রাম স্টেশন বেশি দূরে ছিল না। চট্টগ্রাম পৌছালে বগিতে অবস্থানকারী কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতায় অবশেষে বাবাকে চট্টগ্রামের স্টেশনের পাশে ছোট্ট একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এতো বিপদের মাঝেও বাবার প্রিয় কাচ বিহীন সানগ্লাসটি তিনি হাতছাড়া করেননি। অবশেষে চোখ পরিষ্কার ও পরীক্ষা করে ডাক্তার অবস্থা আশংকামুক্ত বলে ঘোষণা করেন।

বাবা বাসায় পরদিন ফেরত এলেন। চোখের নিচে বেশ কিছু গভীর ক্ষত হয়ে যায়। সারা জীবনেও যাবে না বলে ডাক্তার বলে দেন। বাসায় এলে সকলকে চিন্তামুক্ত করে বাবা ঘটনাটি বললে অবাক হয়ে পড়লাম সকলেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, আব্বু, এতো কিছুর মাঝেও চশমাটি হাতছাড়া করেননি?

তখন তিনি জবাব দিলেন, প্রথম রোজগারে কেনা এ সানগ্লাসটি আমার সারা জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জড়বস্তু যার মর্ম আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না।

সেদিন বুঝলাম বাবার এটিই সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। পরে অবশ্য বাবা চশমাটির কাচ বাধিয়ে নিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটিই ব্যবহার করে গেছেন।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাবা আমাদের ফেলে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এরপর পড়ালেখা অসম্পূর্ণ রেখে বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার উদ্দেশে চলে আসি এমিরেটসে। সঙ্গে আছে বাবার রেখে যাওয়া তার অত্যন্ত প্রিয় সে সানগ্লাসটি। আজীবন সযত্নে রাখবো এ জড়বস্তুটি যার মধ্যে বাবার ছোয়া ও সমস্ত সত্ত্বা মিশে আছে। এটাই হয়তো আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়ে বাবার মতো জীবন গড়তে সহায়তা করবে।

ইউএই থেকে

পুতুল বিয়ে

– শফিকুল আলম পিকুল

আমি তখন শৈশবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন আমরা ভাইবোন মিলে পুতুল খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। আমার সঙ্গী ছিল চারজন। আমি, মেজভাই বিপুল, চাচাতো ভাই মতি এবং ফুপাতো বোন শম্পা। প্রতিদিন বিকেল হলেই আমরা পুতুল নিয়ে বসে যেতাম বাড়ির মধ্যে বড় লিচু গাছটার নিচে। মাঝে মধ্যে পুতুল বিয়ে দিয়ে আমরা আনন্দ করতাম। শম্পার মেয়ে পুতুল, আমার ছেলে পুতুল। ছেলে পুতুল এবং মেয়ে পুতুলকে সুন্দর করে সাজানো হতো। পুতুল বিয়ে উপলক্ষে আমাদের মধ্যে বিরাজ করতো সাজ সাজ রব। পুতুল ছেলের বাবা হতাম আমি। আর শম্পা হতো পুতুল মেয়ের মা।

শম্পা মা সাজার জন্য সুন্দর করে শাড়ি পরে আসতো এবং চোখে দিয়ে আসতো ফুপুর চশমা। চশমা পরলে শম্পাকে পাকা গৃহিণীর মতো মনে হতো।

আমিও বাবা সাজার জন্য পায়জামা–পাঞ্জাবি পরতাম। কিন্তু বাড়িতে চশমা না থাকায় নারিকেলের পাতা দিয়ে চশমা বানিয়ে চোখে দিতাম। চশমা চোখে দিলে বড়দের মতো লাগে। তাই আমাদের এই কৌশল।

আমার চোখে নারিকেলের পাতার চশমা দেখে আমার সহযোগী ভাইবোনরা হেসে বলতো, তোকে তো সত্যিকারের বাবার মতোই লাগছে।

পুতুল বিয়ের মধ্যে মিছিমিছি মাটির ভাত, ডুমুরের ফলের তরকারি রান্না হতো। নারিকেলের মালা হতো হাড়ি, মাটি হতো ভাত এবং ডুমুরের ফল হতো মাংস। নারিকেলের মালায় মাটি দিয়ে ভাত এবং ডুমুরের ফল দিয়ে মাংস, তরকারি রান্না হতো। পুতুল বিয়ের শেষে মিছেমিছি সবাই খেয়ে খেলা শেষ করতাম। সে এক দারুণ অনুভূতি।

নীলমনিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা থেকে

পাত্রী

– এম.এইচ রশীদ ঝিলন

আমার এক আত্মীয়ের জন্য পাত্রী দেখাদেখি চলছে। সেই আত্মীয়ের (বড় ভাই) যোগ্যতা অনুযায়ী ভালো মেয়ের সন্ধান তেমন মিলছে না। যদিও মিলে হয়তো পড়ালেখা কম কিংবা পড়ালেখায় বি.এ পাস কিংবা গায়ের রঙ শ্যামবর্ণের।

আমার সেই বড় ভাই যোগ্যতায় এম.এ পাস। পেশায় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সুতরাং তার জন্য ন্যূনতম বি.এ পাস মেয়ে আমরা খুজছি। অবশেষে একটি মেয়ের সন্ধান পেলাম। মেয়ে বি.এ পাস। পেশায় সদ্য প্রাইমারি স্কুলে চাকরিরত। বংশ মর্যাদা মানসম্মত। মেয়েটি চোখে চশমা ব্যবহার করে। ঠিক হলো আমরা মেয়ে দেখবো। আমরা চারজন আমি, বড় ভাই (পাত্র), এক ভাবী আর ভাইয়ের ছোট বোন।

প্রথমে আমি কথা শুরু করি। বড় ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করালাম। ভাবীসহ আমরা সব কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করলাম। বড় ভাই তো আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি খুব সাবলীল ভঙ্গিমায় সে সব কথার জবাব দিচ্ছে। তার চোখেমুখে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আমি তো মনে মনে খুশি, এবার বুঝি ভাইয়ের পাত্রী মিলে যাবে।

আমরা বাড়িতে গিয়ে ভাবীসহ সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম মেয়ে মোটামুটি ভালো পছন্দ হয়েছে। আমাদের আলোচনা মেয়ে কেন চশমা ব্যবহার করে এই বিষয় প্রশ্ন উঠেছে।

বললাম, চোখের সমস্যা যদি না হয় তাহলে আমরা রাজি হবো।

চোখের চশমা তেমন ব্যাপার নয়। আজকাল সুস্থ মেয়েরাও ফ্যাশনের জন্য চশমা ব্যবহার করে। তবে এই মেয়ে কেন চশমা ব্যবহার করে তা খতিয়ে দেখা দরকার।

পরে ওই মেয়ে সম্পর্কে খোজখবর নিয়ে জানতে পারলাম মেয়ের চোখে সমস্যার কারণেই চশমা ব্যবহার করে। এই চশমা ব্যবহার বাদ দেয়া যাবে না। চশমার পাওয়ার -0.75। এই চশমার পাওয়ারের সুবিধা হলো, দূরের জিনিস স্পষ্ট দেয়া যায়। এই চশমা ছাড়া সূর্যের দিকে তেমন তাকাতে পারে না। সব সময় চশমা ব্যবহার করতেই হবে।

এ চশমা ব্যবহারের কারণেই বড় ভাই বললেন, এই বিয়েতে তার মত নেই। সব কিছু ঠিক ছিল। শুধু বিপত্তি ঠেকলো চোখের সমস্যায় এই চশমা।

ভাইয়াকে বোঝালাম পৃথিবীতে কেউ সম্পূর্ণ মানুষ নন, একটু না একটু ত্রুটি থাকেই। কারোটা দেখা যায় আবার কারোটা দেখা যায় না। আসলে আমরা শুধু তাকাই, দেখি না। দেখার মতো চোখ লাগে।

প্রতিউত্তরে ভাইয়া বললেন, তাই বলে আমি জেনেশুনে চোখ নষ্ট মেয়ে বিয়ে করবো কেন?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এই পর্যায়ে বড় ভাইয়ের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা পর্ব পিছিয়ে গেল।

ভোলা থেকে

সৌভাগ্য

– খন্দকার জিয়া হাসান

চশমা বিষয়ে আমার ছোট্ট দুটো ঘটনা আছে। দুটোই দেশের বাইরে এবং দুটোই পজিটিভ ঘটনা।

প্রথমটি ১৯৯৮ সালের এপৃল মাসে নেপালের কাঠমান্ডুতে সারা দিন ঘোরাঘুরির পর রাতে হোটেলে ফিরে কাপড় চেঞ্জ করার সময় দেখা গেল সানগ্লাসটা নেই। অনেক চিন্তার পর মনে হলো সন্ধ্যায় একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে গিয়েছিলাম তাদের প্যাকেজগুলো জানতে। সম্ভবত ওখানে ফেলে এসেছি। পর দিন তাদের অফিসে ঢোকামাত্রই রিসেপশনের ছেলেটি হাসি মুখে সানগ্লাসটা এগিয়ে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ব্যাংকক–এ এ বছরের জানুয়ারির শেষের দিকে। একইভাবে সারা দিন ঘোরাঘুরি শেষে রাতে হোটেলে ফিরে আবিষ্কার করলাম সানগ্লাস নেই। তবে এবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো সন্ধ্যায় সিলম রোড রবিনসন (থাইল্যান্ডের একটি চেইন শপ)–এ কেনাকাটার সময় কোনো একটা ফ্লোরে হয়তো ফেলে এসেছি।

পরদিন সকালে বামরুনগ্রাদ হসপিটালে আমার স্ত্রীর অ্যাপয়েনমেন্ট ছিল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার দেখানো, বিভিন্ন টেস্ট ইত্যাদি করাতে বিকেল হয়ে গেল। আমার এক চাচাতো বোনও সপরিবারে গিয়েছিল। সবাই মিলে সন্ধ্যার দিকে আবার সিলম রোড রবিনসনে গেলাম।

রবিনসনের এই শাখাটি বিশাল। যতো দূর মনে পড়ে পাচটি ফ্লোর এবং প্রত্যেকটি অনেক বড় জায়গা নিয়ে। থাইল্যান্ডের সেলস গার্ল ও বয়দের ইংরেজির অবস্থা যে ওখানে না গিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

তারা বেশির ভাগই চারটি মাত্র শব্দ জানে, Have, No have, Can, No can. আর সবার হাতে ক্যালকুলেটার। সেটা দিয়ে দর কষাকষি।

যাকেই বলি গতকাল একটি ব্র্যান্ড সানগ্লাস সম্ভবত এখানে ফেলে গেছি সে শুধু ব্র্যান্ড সানগ্লাস শব্দটুকু বোঝে আর দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা ব্র্যান্ড গ্লাস নিয়ে আসে কিংবা তাদের যে কর্নারে সানগ্লাস আছে সেটা আমাকে ইশারায় দেখায়।

অবশেষে তাদের সুপারভাইজার পর্যন্ত পৌছালাম যার ইংরেজি জ্ঞান আমাদের গ্রামের স্কুলে পড়ুয়া সিক্স সেভেনের ছাত্রের মতোই। তবু তাকে বোঝানো গেল এবং সে আমার কাছে দশ মিনিট সময় চাইলো।

টেনশনের দশটি মিনিট! এর মধ্যে সে সব ফ্লোরে তার ভাষায় জানিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে করুণ মুখে সে জানালো, সরি স্যার, গতকাল এখানে কোনো সানগ্লাস পাওয়া যায়নি।

আমার মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল। খুবই প্রিয় একটি সানগ্লাস ছিল এটি। সানগ্লাসের কাভারটা আমার কাছেই ছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে মন আরো খারাপ হচ্ছিল।

বাস্তবতা যখন মেনেই নিয়েছি তখন হঠাৎ মনে পড়লো গতকাল রবিনসনে ঢোকার আগে গেটের পাশে মানি এক্সচেঞ্জে টাকা ভাঙিয়েছিলাম। ওখানে ফেলি আসিনি তো?

দৌড়ে সেখানে গেলাম। সমস্যা বললাম।

লোকটি বললো, গতকাল আমি ডিউটিতে ছিলাম না। যে মেয়েটি ছিল সে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আবার অপেক্ষার পালা। মেয়েটি এলো। কভার দেখিয়ে বললাম, এই ব্রান্ডের একটি সানগ্লাস সে পেয়েছে কি না।

ড্রয়ার খুলে সে হাসি মুখে সানগ্লাসটা বের করে দিল।

ঢাকা থেকে

কুদরত

– মোল্লা আবদুর রহিম

ঘন সবুজের নিবিড় জঙ্গল, নানান রকমের পাখির কুজন আর বনফুলের গন্ধে মন ভরে গেল। বাড়ির কাছের সুন্দরবনে এই প্রথম এলাম। দুই তিন ঘণ্টা গভীর জঙ্গলে হেটে কোথাও একটি হরিণেরও দেখা পেলাম না। একটা গর্জনের প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। তাহলে কি আমরা ভুল পথে চলে এসেছি! যেখানে বাঘিনি বাচ্চা দিয়েছে সেই দিকটায় আমরা যেন না যাই। বনে ঢুকতেই একজন ফরেস্টার এ কথা বলে দিয়েছিলেন। বাচ্চাদের দুই তিনশ গজের মধ্যে এ সময় সকল প্রাণীই বাঘিনির কাছে বিপদজ্জক।

দূর থেকে সম্ভবত সে আমাদেরকে টের পেয়ে হুংকার শুরু করে। আরো স্পষ্ট গর্জনে আমরা ভয়ে কাপতে লাগলাম। মুহূর্তের মধ্যে শিকারিমামা বন্দুক নিয়ে গাছের ওপরে উঠে গেলেন। আমি আর মঈনভাই পড়িমড়ি করে একটা কাত হওয়া গাছের মাথায় উঠলাম। এবং আমাদের দুলাভাইয়ের ছোট ভাই সোলেমান অবশেষে হাত–পা ছিলে গাছে উঠে হাপাচ্ছিল। বন বিশেষজ্ঞ (আসলে অনভিজ্ঞ) ও সাহসী (কিন্তু চরম ভীরু) বলে তাকে আনা হয়।

বাঘিনি আমাদের কাত হওয়া গাছের প্রায় কাছে এসে শিকারের নিশানা ঠিক করার মুহূর্তে আমাদের চোখের চশমায় চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অতি দ্রুত পিছু হটতে লাগলো।

আমার বাবা একজন পরহেজগার আলেম। জঙ্গল দেখতে আসতে তিনি আমাদের দুই ভাইয়ের চশমায় দোয়া–কালাম পড়ে ফু দিয়ে বলেছিলেন, প্রতিপক্ষ যতো হিংস্র কিংবা শক্তিশালী হোক না কেন, চশমায় চোখ পড়লেই তার দিল নরম হয়ে যাবে।

ঘটলোও তাই।

খানিক পরে গাছ থেকে নামবো কি নামবো না! এমন সময় আরেক ঘটনা। প্রথমে দুই একটি করে, পরে পালে পালে অজস্র হরিণ দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের সামনে থেকে একটু দূরে নিচু জলাশয়ের কাছে সমবেত হতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হলো জঙ্গলের সমস্ত হরিণকুল সেখানে একত্রিত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিণকুলের সেই মহা সমাবেশে হাজির হলো উচু এক তেজী ঘোড়া।

আমরা চুপচাপ। অবাক কাণ্ড! ঘোড়াটি জলাশয়ে নেমে পানিতে ডুবিয়ে মনে হলো গোসল করলো। সেই সঙ্গে হরিণেরও তা–ই করলো। একে একে কূলে উঠে সকলে গা ঝেড়ে শুকনো হওয়ার চেষ্টা করলো। এরপর আবার হরিণেরা তাদের আগের গন্তব্যে ছুটতে লাগলো। সব শেষে যে ঘোড়াটিকে এই মাত্র দেখলাম, চোখের পলকে সে হারিয়ে গেল।

আমরা সবাই নিচে নামি। সোলেমান বন্দুক দিয়ে পালের গায়ে গুলি করতে চেয়েছিল। কিন্তু গুলি ফোটে না। বন্দুক ফেলে ঘোড়া ঘোড়া বলে জোরে চিৎকার করতে লাগলো।

শিকারিমামা অভিজ্ঞ লোক, তিনি অনেক কিছু আচ করতে পারলেন। শিকার দরকার নেই, বহু কষ্টে দৌড়ে আমরা প্রাণ নিয়ে জঙ্গল থেকে পালালাম।

মোড়লগঞ্জের ছোট ভোলা নদীর দক্ষিণ পাড়ে জঙ্গল আর উত্তর পাড়ে দুলাভাইদের বাড়ি। জঙ্গল দেখতে এখানেই উঠেছি আমরা। সোলেমানের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যেতে লাগলো।

১৯৭৫ সালের শেষ আগস্টের অন্ধকার রাতে টিপ টিপ বর্ষা পড়ছে। ওঝা আনা হলো। তিনি রোগী দেখে উপরি আছরের কথা বললেন।

ঘরের মেঝেতে বৃত্ত একে সোলেমানকে শোয়ানো হলো তার মধ্যে। পানি পড়া আর ফু–ফিকিরের পরে লাঠি দিয়ে বৃত্তের মাটি পিটিয়ে ওঝাবাবা উপরি আচর ছাড়ানোর চেষ্টা শুরু করলেন।

তদবিরের পর তদবির চলতে লাগলো। কিন্তু রোগীর উন্নতি হলো না। আমরা কেউ-ই দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

রাত শেষ হয়ে প্রায় ভোর হলো। সোলেমান মাথা তুলে চারদিকে তাকিয়ে ওঝাবাবার লাঠিখানা হাতে নিয়ে দাড়ালো। তারপর ওঝাবাবাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করলো।

ওঝাবাবা চিৎকার দিয়ে ঘরের বাইরে দৌড় দিলে সোলেমান তার পিছু নিল।

ওঝাবাবার প্রাণ বাচাতে আমরা তাকে চশমা পরিয়ে দিই।

মহৌষধের কাজের মতো সোলেমান লাঠি ফেলে একদম যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল।

শিকারিমামা আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ডিঙি নৌকা ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে এলে আমার বাবা সকল ঘটনা শুনে বললেন, পাকপরওয়ার দিগারের কুদরত কেউ বোঝে আবার কেউ বোঝে না।

খুলনা থেকে

সম্পাদক ও গ্যাটিস

– করিম চৌধুরী

ছাত্র জীবনে তিন চারটি দৈনিক পত্রিকা পড়তাম। ১৯৮৮ সালের কথা। যায়যায়দিন তখন নিষিদ্ধ। সম্পাদক লন্ডনে নির্বাসিত। মিনার মাহমুদ-এর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *বিচিন্তা* তখন কিছুটা জনপ্রিয়। মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত সাপ্তাহিক *খবর* তখন দৈনিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি *দৈনিক খবর*-এর পাঠক ছিলাম না। আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু যারা ছাত্রলীগ করতো তারা সবাই ছিল দৈনিক খবরের পাঠক।

এক সিনিয়র বন্ধু যিনি জেলা ছাত্রলীগের প্রভাবশালী নেতা তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, সন্ধ্যার পর তুই একটু বাসায় আসিস। দরকার আছে।

বাসায় গেলে তিনি আমাকে দুটো দৈনিক খবর হাতে দিয়ে বললেন, তুই তো অনেক পত্রপত্রিকা পড়িস। দুদিনের এই দুটো খবর পত্রিকা দেখে আমাকে বলতো সমস্যাটা কোথায়? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু মনে সন্দেহ জাগছে। কোথায় যেন একটু গ্যাঞ্জাম।

রাত তিনটা পর্যন্ত গভীর মনোযোগে পত্রিকা দুটো পড়ে সিনিয়রভাইকে রিপোর্ট দিলাম যে, আগের দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত চল্লিশটা বড় নিউজ পরের দিনের পত্রিকায় হুবহু ছাপা হয়েছে। শুধু পৃষ্ঠা ও কলাম পরিবর্তন করে। দৈনিক খবরের ওই দুটো সংখ্যা ছিল ২২ ও ২৩ মে ১৯৮৮। নিউজগুলো মার্ক করে পত্রিকা দুটো নিয়ে খবর অফিসে গেলাম। তখন খবর অফিস ছিল ১৩৭ শান্তিনগর। এখন কোথায় জানি না।

দোতলায় উঠে হরতন-এর গোলামের মতো গোফওয়ালা এক ভদ্রলোককে বললাম, সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভদ্রলোক পাচ সের ওজনের এক বিশাল খাতা আমার সামনে মেলে ধরে নাম ঠিকানা ও সাক্ষাতের কারণ লিখতে বললেন।

ভাবলাম, আরে, বিরাট ব্যাপার-স্যাপার তো! কারণ লিখলাম, খবর পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এবার ওই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে চাপাবাজি শুরু করলেন। কি অভিযোগ আমাকে বলেন, সম্পাদক এখন ব্যস্ত, বম্বে থেকে লোক এসেছে, দেখা করা সম্ভব না।

বললাম, কোনো অসুবিধা নেই। আমার সময় আছে। আমি সিড়িতে বসে থাকবো। সম্পাদক অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় সিড়িতেই কথা বলবো।

উল্লেখ্য, ওই ভদ্রলোক আমাকে বসতে বলেননি, এমনকি তার সামনে ভিজিটর চেয়ার নেই।

আমার এই নাছোড়বান্দা আচরণে শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের রুমে প্রবেশ করার অনুমতি পাই। রুমে ঢুকেই দেখি টেবিলে কনুই ঠেস দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত থুতনিতে লাগিয়ে সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান বসে আছেন। তার চোখে একটা রেকটাংগুলার ফ্রেমের ছোট চশমা। চশমাটা নাকের ডগায় লাগানো। এমন চশমা আগে দেখিনি এবং এভাবে চশমা পরতেও কাউকে দেখিনি। তবে সামরিক প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক পোশাকে টিভিতে যখন ভাষণ দিতেন তখন এই স্টাইলে চশমা পরতেন।

সম্পাদকের টেবিলে পত্রিকা দুটো মেলে ধরে সবগুলো রিপিট নিউজ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ কি?

তিনি বললেন, পৃন্টিং মিসটেক, ছাপাখানায় অনেক সমস্যা হয়। আরো অনেক কথা।

বললাম, মিসটেকই যদি হবে তাহলে পৃষ্ঠা নাম্বার ও কলামগুলো পরিবর্তিত হলো কেন? একটা দুটো নিউজ হলে কথা ছিল। চল্লিশটা বড় নিউজ।

যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির পর অধৈর্য হয়ে বললাম, এটা ইচ্ছাকৃত এবং ইনটেলেকচুয়াল ডিসঅনেস্টি।

এবার তিনি চশমার ফাক দিয়ে নব্বই ডিগ্রি অ্যাংগলে তাকিয়ে বললেন, একজন সম্পাদকের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে না।

বললাম, আমি শুধু সম্পাদকের সঙ্গেই কথা বলছি না, পত্রিকার মালিকের সঙ্গে কথা বলছি। পাঠকেরা পয়সা খরচ করে পত্রিকা কেনে বলেই আপনার পত্রিকা চলে। একই নিউজ পাঠক কেন দুবার পড়বে?

এবার তিনি কিছুটা সুর নরম করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার পিঠ চাপড়ে আদরের ভঙ্গীতে বললেন, ছোট ভাই, আমার প্রতিষ্ঠান বড়। সব দিক ম্যানেজ করতে পারি না। তাই মাঝে মধ্যে গ্যাটিস দিই অর্থাৎ একই খবর পুনরায় ছাপি।

সরল স্বীকারোক্তি বটে!

প্রসঙ্গ পাল্টে এবার বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এতো বাধা কেন?

তিনি বললেন, আমার সঙ্গে তো দেখা করতে পেরেছেন, ইত্তেফাকে গেলে তো অফিসেই ঢুকতে দেবে না।

আমি ইত্তেফাকের সিরিয়াস পাঠক। *উপসম্পাদকীয়* কলামগুলো, *নিবেদন–ইতি, অভাজন, স্থান–কাল–পাত্র, লুব্ধক, ঘরে–বাইরে, সন্ধানী, প্রিয়–অপ্রিয়, সত্যদর্শী–চতুরঙ্গ, সুহৃদ* কোনো দিন বাদ দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে ইত্তেফাক ভবনে কোনোদিন যাইনি।

খবর অফিস থেকে বের হয়ে গেলাম ইত্তেফাক ভবনে। একজন পাঠক কেন পত্রিকা অফিসে ঢুকতে পারবে না এই মনোভাব নিয়ে। ইত্তেফাক ভবনে ঢুকতে আমাকে কেউ বাধা দেয়নি। দোতলা বা তিন তলায় খুব সম্ভবত তিন তলার বিভিন্ন রুমে উকি দিচ্ছি। এক রুমে সুদর্শন মধ্য বয়সী এক ভদ্রলোক গভীর মনোযোগে কি যেন লিখছেন।

সাহস করে রুমে ঢুকতেই ভদ্রলোক শান্ত ভাবে আমার দিকে তাকালেন। এই ভদ্রলোকের চোখেও চশমা। তবে এই চশমার ফ্রেমটি বড় এবং মোটা। স্কয়ার নয়, আবার রাউন্ডও নয়। হুমায়ূন আহমেদ–এর *সবুজ ছায়া* নাটকে মাস্টারের ভূমিকায় সালেহ আহমেদ যে রকম চশমা পরতেন ঠিক সে রকম এই চশমাটি।

বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিয়ে বললাম, আমি ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বশীল কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সামনের চেয়ার দেখিয়ে তিনি আমাকে বসতে বললেন। তিনি সুনির্দিষ্ট নাম জানতে চাইলেন যে, কার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বললাম, আমি কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তবে লেখার সঙ্গে পরিচিত। যেমন *লুব্ধক* – আখতার–উল–আলম তিনি তখন ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, অভাজন – আবেদ খান, সত্যদর্শী – মহাদেব সাহা, সন্ধানী – হাবিবুর রহমান মিলন, সুহৃদ – রাহাত খান, তাদের মধ্যে যে কেউ একজন।

আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি শান্ত ভাবে বললেন, আমি আবেদ খান। কিছু বলবে? কোনো অভিযোগ?

আমি তাৎক্ষণিক চেয়ার ছেড়ে দাড়িয়ে শ্রদ্ধেয় কলামিস্টকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিলাম। অর্থাৎ দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। উল্লেখ্য, *নিবেদন-ইতি* সাধু ভাষার ওই কলামটি আমার অন্যতম প্রিয় কলাম ছিল।

এরপর দৈনিক খবরের রিপিট নিউজগুলো দেখালাম এবং সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানের গ্যাটিস দেয়ার কথা বললাম। এরই মধ্যে তৎকালীন ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আখতার-উল-আলম ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক রাহাত খান এলেন। আবেদ খান আমাকে দেখিয়ে দুজনকে ঘটনাটি বললেন।

পরে আবেদ খান আমাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে প্রেস কাউন্সিলে কেস করতে পারো। পাঠকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একই নিউজ পুনরায় প্রকাশ করে পাঠককে প্রতারিত করা হয়েছে ইত্যাদি।

বললাম, ওসব ঝামেলায় আমি যাবো না। আপনি লেখক। আপনার নিবেদন-ইতি কলামে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখলে খুশি হবো।

আবেদ খান আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। ৬ জুন ১৯৮৮ সালের দৈনিক ইত্তেফাকের নিবেদন-ইতি কলামে মিজানুর রহমান মিজানের গ্যাটিস দেয়ার ঘটনাটি উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ পত্রিকা সম্পাদক চশমা পরেন। দয়া করে রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা পত্রিকার নিউজে আপনারা গ্যাটিস দেবেন না, প্লিজ! আপনাদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা।

ফ্লোরিডা, আমেরিকা থেকে

karimfl@aol.com

অচেনা

- ওবায়দুল কবীর নান্না

পুরনো রঙ উঠে যাওয়া একটা রে-ব্যান চশমা উপহার দিয়েছিল বন্ধু টুটুল। হোক পুরনো, রঙ উঠে যাওয়া, তবু ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। অতি কাছের মানুষের থেকে উপহার পেয়ে সবাই এ রকম খুশি হয়।

সাত বছর আগে যখন বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে আসি তখন সে একটা ডায়রি উপহার দিয়েছিল। তখন আনন্দে আমার কান্না এসেছিল। কারণ সে তখন ছিল বেকার। আমার জন্য তার অনর্থক টাকা খরচ হলো। ছোটবেলা থেকেই কারো কাছ থেকে প্রকৃত ভালো ব্যবহার পেলে আমার কান্না আসে।

যাহোক, ওই চশমার কথাই বলি।

গত ঈদে ছুটিতে গিয়ে দেশে তিন মাস ছিলাম।

ফিরে আসার কিছু দিন আগে সে আমায় বললো, তোমাকে যে চশমাটা দিয়েছিলাম ওটার গ্লাস বদলে যদি আমি পরি তাহলে কেমন মানাবে?

বলতে পারলাম না ওটা তুমিই তো আমাকে দিয়েছিলে, আবার তোমাকে কেমন মানাবে তা জানতে চাইছো কেন?

আমি চশমা পরায় তেমন উৎসাহী নই। ভেবেছিলাম তার কাছ থেকে পাওয়া গিফট সযত্নে রেখে দেবো। কিন্তু পারলাম না। চলে আসার এক সপ্তাহ আগে তাকে সেই চশমা দিয়ে বললাম, তোমাকেই সুন্দর মানাবে। কাউকে কিছু দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নেয়া বুঝি না কিভাবে সম্ভব? নিজের প্রতিই সন্দিহান হয়ে পড়ি। এতো বছর যার হৃদয়ের বিশালতা, ব্যাপকতা নিয়ে গর্ব বোধ করতাম এই কি সেই মানুষ!

এই দূর প্রবাসে থেকেও চিরপরিচিত সেই মানুষটিকে এখন ভীষণ অচেনা মনে হয়।

কুয়েত থেকে

কিছু ঘটনা

– সুমন আহসান

স্কুল জীবনে একটা ধাধা শুনেছিলাম, *কোন সে পালোয়ান, নাকে বসে ধরে কান?*

উত্তরটা হচ্ছে চশমা। এই চশমা যে দৈনন্দিন জীবনে কতোটা প্রয়োজনীয় তা যাদের চোখের সমস্যা তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারেন। আল্লাহর রহমতে চোখের সমস্যা না হওয়ায় এ পর্যন্ত আমাকে চশমা চোখে দিতে হয়নি। শখের বশে কখনো সানগ্লাস ছুয়েও দেখিনি। কিন্তু চশমার কথা শুনলেই বেশ কিছু ঘটনা মনের অজান্তেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এক. আমার নানি ও ছোট খালা দুজনেরই চোখে সমস্যা। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তারা চশমা ব্যবহার করেন। একবার নানির চশমার ফ্রেম ভেঙে যাওয়ায় নতুন ফ্রেম কিনতে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, রাতে ফ্রেম কেনার কারণে রঙ ঠিক মতো দেখা হয়নি। বাসায় ফিরে দেখা গেল ছোট খালা ও নানির চশমার ফ্রেম একই রঙের। তাই ঠিক হলো রাতটা চলুক, পরের দিন বদলানো যাবে।

পরদিন সকালেই যতো বিপত্তি। নানি সকালে নাশতা তৈরি করার আগে চশমা চোখে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার মনে হতে লাগলো, তার চোখ দুটো যেন আরো বেশি সমস্যা করছে। কেননা তিনি কিছুই ঠিক মতো দেখতে পারছেন না।

ওদিকে ছোট খালা পড়তে বসে বলতে লাগলেন, তার মাথাটা যেন ভীষণ ব্যথা করছে, বইয়ের পড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

ইতিমধ্যে বুঝে গেছি ঘটনা কি? দ্রুত নানি ও খালার চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে বদল করে দিলাম, ব্যস সব ঠিক। আসলে হয়েছে কি সকালে ওঠে নানি চোখে দিয়েছিলেন ছোট খালার চশমা এবং খালা নানিরটা। তাই তো এই সমস্যা। অবশ্য পরে আর এ রকম ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। কারণ সেদিনই নানির চশমার ফ্রেম পরিবর্তন করে অন্য রঙের আনা হয়েছিল।

দুই. আমার খালাতো ভাই নির্ঝর। তার যখন তিন বছর বয়স তখন খালা–খালু ভাবলেন ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা দরকার। বই খাতা কিনে এনে তাকে পড়তে দেয়া হলো। পড়তে বলায় সে বলতে লাগলো, বইযের কোনো কিছুই সে দেখতে পারছে না।

খালা–খালু ভাবলেন পড়াশোনা না করার জন্য হয়তো সে এই কথা বলছে। তাকে বলা হলো, এটা পড়ার না, গল্পের বই। তবুও তার একই কথা।

শেষে চোখ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায় যে, নির্ঝরের চোখের সমস্যার কারণে ছোট আকারের কোনো কিছুই সে দেখতে পারবে না। তাকে সব সময় মোটা কাচের হাই পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করতে হবে।

কি আর করা! বেচারার চোখে সেই থেকে চশমা।

তিন. রংপুর জেলা স্কুল ফুটবল টিম রাজশাহীতে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গেছে। দলের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোজাহিদ মোর্শেদ আরিফ। বিকেলে খেলা হবে জেনে সকাল দশটার দিকে কয়েকজন বন্ধুসহ আরিফ চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যায়। বানরের খাচার সামনে দাড়িয়ে কিছুটা কসরত করার সময় একটা বানর হঠাৎ আরিফের চোখের চশমাটা টেনে ধরে। টানাটানির এক পর্যায়ে দেখা গেল চশমার অর্ধেকটা খাচার ভেতরে আর অর্ধেকটা আরিফের হাতে।

বেচারা আরিফ তো একেবারে বোকা হয়ে গেছে।

সেই মুহূর্তে দ্রুত চশমা যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে অর্ধেক চশমা চোখেই আরিফ ফিরে আসে। এবং ভাঙা চশমা চোখেই স্কুলের খেলা দেখে। ফুটবল টিম যখন রাজশাহীর থেকে ফেরত আসে তখন আরিফের চশমার কাহিনীটি বেশ ঘটা করে সবার সামনে প্রকাশ করা হয়।

চার. আমি তখন রংপুর জেলা স্কুলের ক্লাস টেন-এর ছাত্র। একদিন মোনেমস্যার ক্লাসে জ্যামিতির এক্সট্রা শেখাচ্ছিলেন। একটা এক্সট্রার প্রমাণ কিছুতেই মিলছিল না। হঠাৎ করে আমার বন্ধু শিমুল বলে উঠলো, স্যার চর্তুভুজের A, C কর্ণ যোগ করতে হবে। তাহলে প্রমাণ মিলবে।

স্যার রেগে আগুন, কি বললি! তুই আমাকে A, C যোগ করাবি। তোর চশমা খোল।

চশমা খুলতেই শিমুলের গালে অনবরত স্যারের হাতের চড় পরতে লাগলো।

স্যারের রাগ কমলে তিনি চড় মারা বন্ধ করলেন। ক্লাস ছেড়ে যাওয়ার আগে বললেন, আজ থেকে চশমাওয়ালারাই আামর টার্গেট।

এখানে বলা দরকার, চর্তুভুজ সংক্রান্ত ওই এক্সট্রাটি প্রমাণ করতে A, C কর্ণ অবশ্যই যোগ করতে হয়। স্যারের হয়তো তখন মনে ছিল না।

সকলের প্রতি আহ্বান, আসুন আমরা সকলে চোখের যত্নে সচেতন হই। চোখের কোনো সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে যাই এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিই।

বুয়েট, ঢাকা থেকে

শ্রদ্ধার্ঘ

– বিশ্বজিৎ সরকার

সানগ্লাস-এর প্রতি আমার দুর্বলতা সেই কৈশোর থেকেই। কিন্তু যতোই তাকে আপন ভেবে কাছে টেনে নিতে চাই ততোই সে আমাকে দূরে ঠেলে দেয়। জীবনের চরম মূল্য দিয়ে ওটাকে আজ বাক্স বন্দী করে রেখেছি।

সুন্দর যা কিছু আছে সব সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি। মানুষ সুন্দরের পূজারি। তাই ভাবতাম, কেবল ভদ্র সামাজিক ও সুরুচিপূর্ণ নারী-পুরুষেরাই সানগ্লাস ব্যবহার করেন। বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির পর আমার এই ধারণা ভুল বলে বিবেচিত হয়েছে।

দিনে দিনে এই বস্তুটির প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়তেই থাকলো।

সানগ্লাস পরা কোনো অতিথি বেড়াতে এলেই তার পিছু নিতাম এবং সুযোগ বুঝে চোখে লাগিয়ে আনন্দে আত্মহারা হতাম। মা হাসতেন। বাবা বকাঝকা করতেন। এ রকমই এক অতিথি ভোলাকাকা। সুদর্শন, সুপুরুষ আমাদের বাড়িতে যতোবারই তাকে দেখেছি, সানগ্লাস থাকেই তার সঙ্গে। নাম ভোলা হলেও কোনো কিছুই ভুলতেন না তিনি।

আমি তখন এসএসসি-তে ডাব্বা মেরে ভবঘুরে খেতাব অর্জন করেছি। বাবা আর লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারছিলেন না। লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হবো এমন চিন্তা বাদ দিয়ে স্থানীয় এক ফটো স্টুডিওতে কর্মচারীর পদ বরণ করে জীবন নামের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলাম।

এমনি এক লগ্নে ভোলাকাকার আবির্ভাব ঘটলো আমাদের বাড়িতে।

তাকে দেখে সানগ্লাস ভূত আমার মাথায় চেপে বসলো। সেটা পাওয়ার আগ্রহ বেড়ে গেল। কিছুতেই নিজেকে সামাল দিতে পারছিলাম না। লোভ সংবরণ করতে না পেরে ওটা চুরি করে ফেললাম।

সকালে বাড়িতে হই চই হলো। সব ঠিক আছে, শুধু সানগ্লাস নেই। এ কেমন চোর?

ওই যাত্রা বেচে গেলাম।

কিছু দিন ওটাকে গোপনে রেখে চুরি করা মালের নিয়ম মেনে সাবধানে ব্যবহার শুরু করলাম। স্টুডিওর ড্রেসিং টেবিলে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হলাম। এরপর আমার চলন–বলনে একটা পরিবর্তন এলো। বন্ধুদের কাছে ঈর্ষণীয় এবং যুবতীদের স্বপ্নের পুরুষে পরিণত হলাম। কিছু মেয়ের প্রেমপত্র সেটাই প্রমাণ করে। এভাবে দিব্যি তিন চারটি বছর কেটে গেল। ওটাকে এখন নিজের বলে ভাবতে লাগলাম।

কিন্তু বিধি বাম! এক বৃষ্টি ঝরা দিনে হঠাৎ ভোলাকাকা এসে উপস্থিত।

যেন আমার মাথায় বাজ পড়লো।

আমার চোখে ওটা দেখে তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন সানগ্লাসটি তার।

আমাকে পাকড়াও করে বাবার হাতে তুলে দিলেন এবং কটাক্ষ করে বাবাকে বেশ কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন যা বাবার পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল।

বাবার আত্মসম্মান বোধ প্রখর।

পরিণামে সেদিন আমার ভাগ্যে যা জুটলো গত বিশটি বছর তার রেশ টেনে নিয়ে চলেছি...। একটি চুরি, একটি শখ একজন মানুষকে তার পরিবার থেকে কতোটা বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে, আমি তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাবা রাগে–ক্ষোভে আমাকে বেদম প্রহার করলেন। আমার দুটো দাত ভেঙে গেল।

তাজা রক্তে সারা শরীর ভিজে গেল।

তারপরেও আমার পাপ মোচন হলো না।

আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। একজন চোর সন্তানের পিতা তিনি হতে চান না। ও বাড়িতে ফিরে গেলে মরামুখ দেখতে হবে বলেও প্রতিজ্ঞা করলেন।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম জেনে আমি আমার পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি। আমার আর বাড়িতে ফেরা হয়নি। এক পা, দুই পা করে বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে এসেছি।

ওই ঘটনার পর থেকে আমার কোনো প্রকার সাহায্য তারা নেননি।

ইতিমধ্যে মা স্বর্গবাসী হয়েছেন, তার শেষ আশীর্বাদটুকুও পাইনি।

ভাইবোনদের বিয়ে হয়েছে। সন্তানাদিও হয়েছে। তাদের ইচ্ছে আমিও বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করি।

আমার ইচ্ছে যে ছিল, মায়ের কোলে মাথা রেখে বলি, মা! আমি চোর নই। বাবার চরণ ছুয়ে বলি, বাবা! আমাকে তুমি ফিরিয়ে নাও। অবুঝ আমি নিতান্তই শখের বশবর্তী হয়ে এমন অন্যায় করেছিলাম। আমায় ক্ষমা করো। তোমার বুকে টেনে নিয়ে সমাজকে জানিয়ে দাও, তোমার সন্তান চোর নয়, তোমার সন্তান অসৎ নয়। বিশ্বাস করো, এখন আর আমার কোনো শখ নেই। সেদিনের পর আমি আর অন্যায় পথে যাইনি। অনেক কষ্টের বিনিময়ে নিজেকে সৎ হিসেবে গড়ে তুলেছি।

অনেক কাঠ–খড় পুড়িয়ে আজ আমি সাউথ কোরিয়া–য় অবৈধ শ্রমিক হয়ে বসবাস করছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমের অর্থে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কম্পানির দুটো সানগ্লাস কিনে বাক্স বন্দী করে রেখেছি। এর একটা তোমার, একটা আমার। পিতা–পুত্রের মহা মিলনের দিনে গত বিশ বছরের চরম মূল্য দিয়ে কেনা এই সানগ্লাসটি তোমায় শ্রদ্ধার্ঘ দিতে চাই।

সিউল, সাউথ কোরিয়া থেকে

যত্ন

– মাসুদা খান

আজ থেকে তেইশ বছর আগে আমাদের জেলা থেকে আরেক জেলায় আমার আব্বা জরুরি কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জীবিত ফিরে আসেননি।

তিনি মোটর সাইকেলে করে ফিরছিলেন। একটি গাছের নিচ দিয়ে আসার সময় মৌমাছির চাক তার ওপর ভেঙে পড়ে। মৌমাছির কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি মারা যান।

আমার আব্বা একজন চোখের ডাক্তার ছিলেন। সেই সময় আমার আব্বার মতো দক্ষ চোখ বিশেষজ্ঞ কম থাকার কারণে আশপাশের জেলাগুলোতেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাই স্থানীয় লোকজন তাকে চিনতে পেরে গোসল দিয়ে, কাফন পড়িয়ে ট্রাকে করে আমাদের বাসায় নিয়ে আসেন।

আব্বা চার কোণা কালো ফ্রেমের একটি খুব সুন্দর ও দামি চশমা পরতেন। তখন মানুষজন অনেক ভালো ও সৎ ছিল বলে তার কাপড়, টাকা এবং চশমাটাও সঙ্গে নিয়ে আসেন।

আমার আম্মা খুব যত্নের সঙ্গে তার কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে সেই চশমাটাও দীর্ঘ দিন যাবৎ রেখে দিয়েছেন। কাপড়ের রঙ ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু আম্মার আচলের স্পর্শে চশমাটা আজও ঝকঝকে আছে।

প্রতি মাসে একদিন আম্মার আলমারি গুছিয়ে দিই। যখনই আলমারি খুলি, প্রথমেই আব্বার চশমাটা হাতে নিই। হাতে নিয়ে আব্বার স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করি। চোখে দিয়ে আব্বার ছবির দিকে তাকাই। নিজের মধ্যে আব্বার প্রতিচ্ছবি খোজার চেষ্টা করি। নিজের কাপড় দিয়ে যত্নের সঙ্গে ঝকঝকে চশমাটা আবারও মুছে যথাস্থানে রেখে দিই।

উত্তর বালুবাড়ি, দিনাজপুর থেকে

বৈচিত্র

– শাহাব উদ্দিন আহম্মেদ

ছোট সময় আমার ফুটফুটে বোন রেণু বলেছিল, ভাইয়া, আমাকে একটা চশমা কিনে দেন।

বোনটির আবদার মিটিয়েছিলাম মাত্র দুই টাকায়। এবং এ দুই টাকার বিনিময়ে বোনটি যে খুশি হয়েছিল তা আজ পর্যন্ত আর কোনো কিছু দিয়ে বোনটিকে সেই খুশি, সে উৎফুল্ল করতে পারিনি। নিজের চশমা বা সানগ্লাস পরার অভ্যাস তেমন নেই। তাই এটা নিয়ে তেমন অভিজ্ঞতাও নেই। তবে চশমা বা সানগ্লাসের বহু বৈচিত্র দেখেছি।

অনেকের চোখে ত্রুটি দেখা দিলে চশমা ব্যবহার করে। অনেকে দূরের জিনিস দেখতে পায়, কাছেরটা পায় না। তখন তারা ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক উত্তল লেন্স বা অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক হয়ে যায়।

অনেকের চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং মাথা ব্যথা করলেও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চশমা ব্যবহার করে ফল পেয়েছে। কেউ কেউ আবার এক চোখ ট্যারা বা অন্ধ হলে চশমা ব্যবহার করে যাতে অপরিচিত কেউ বুঝতে না পারে।

চশমার বেশির ভাগ কালার সাধারণত শাদা দেখা যায় যদিও ফ্রেমের অনেকটা বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায় সানগ্লাস পরার বেলায়। বাহারি কালারে সানগ্লাসে বাহারি কালারের ফ্রেম। তার ব্যবহারও বাহারি ধরনের। আর এই বাহারি ব্যবহারে অনেকের প্রকৃতি ফুটে ওঠে। যেমন কোনো কোনো গ্লাসে মানুষকে নম্র, ভদ্র বা শিক্ষক-শিক্ষিকার মতো বোঝায়। কোনো কোনো গ্লাসে আবার মানুষকে দুষ্ট, অভদ্র বা মাস্তান ভাব বোঝায়। কেউ কেউ যেন রঙিন সানগ্লাস পরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনটাকেও রঙিন করে নেয়। সানগ্লাস পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের মনও পরিবর্তন হয়, পরিবর্তিত হয় তাদের পৃথিবী। তাদের পা যেন মাটিতেই পড়তে চায় না। সাধারণ মানুষগুলোকে যেন মানুষই মনে হয় না। কেউ কেউ সানগ্লাস পরে নাকের গোড়ায়, কেউ কেউ পরে নাকের মাঝখানে, কেউ আবার নাকের অগ্রভাগে। তবে যারা অগ্রভাগে পরে তারা হয়তো গ্লাসের ওপর বা নিচ দিয়েই দেখার চেষ্টা করে বেশি। এবং এই কাজটা সাধারণত মেয়েরা করে বেশি। যদিও লুৎফর রহমানের একটি উপন্যাসে পড়েছি যে, মেয়েদের তৃতীয় একটি

চোখ আছে, আর সে চোখটা শুধু ছেলেদের দেখার জন্য। তবে সানগ্লাসের ফাকে দিয়েও সে কাজটা তারা ভালো মতোই করতে পাড়ে। আবার নেইলপলিশ রাঙানো আঙুলে একটু পর পর সানগ্লাসটাকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়ার দৃশ্যও খারাপ না।

যাক, কেউ কেউ আবার সানগ্লাস পরে কপালে বা মাথায়। আমরা সাধারণত সূর্যের আলো থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করি। যারা কপাল ও মাথায় ব্যবহার করে তারা রক্ষা করে কি? অবশ্যই মাথা ও কপালকে।

অনেকে আবার সানগ্লাস ব্যবহারের চেয়ে শার্ট বা টি–শার্টের সঙ্গে বুকের ওপর ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে। বাংলাদেশের মেয়েদের ওড়না পরতে হয় বলে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তবে ইওরোপের মেয়েরা ঠিকই এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। অনেকে আবার সানগ্লাস পরে ছবি তোলে আনন্দ পায়।

সানগ্লাস বিক্রেতার মধ্যেও অনেক বৈচিত্র দেখা যায়। কেউ কেউ বিক্রি করে রাস্তায়, ফুটপাথে, ওভারবৃজে কেউ বা আবার বিশাল দোকানে। অনেক বিক্রেতা কোনো বড় নেতা বা চলচ্চিত্র অভিনেতা–অভিনেত্রীদের কাছে চশমা বিক্রি করে কিংবা সানগ্লাস বিক্রি করে গর্ববোধ করে ও আনন্দ পায়।

অনেকে টাকা খরচ করে, অনেক কষ্ট করে ইটালি–তে আসে। এসে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বাচার তাগিদে অনেকে অনেক কিছু করছে। এর মধ্যে সানগ্লাস বিক্রি করাও অন্যতম। এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বললেই নয়। একটি বোর্ডের মধ্যে সানগ্লাস সাজিয়ে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকে। এর মধ্যে আসে পুলিশ, দেয় বোর্ড নিয়ে দৌড়। অনেকে নিজেকে বাচাতে বোর্ড ফেলে দেয়। তখন পুলিশ সেগুলো নিয়ে যায়। যারা রক্ষা করতে পারে তারা পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবার এসে তাদের ব্যবসা শুরু করে।

এভাবে পুলিশের হয়রানির মুখে টাকা উপার্জন করে দেশে পাঠাচ্ছে। আর সেই টাকার ওপর বিভিন্নভাবে ট্যাক্স বসাচ্ছে চশমা পরা লোকগুলো। তখন দেখার বিষয় ওই চশমা পরা লোকগুলোর কাছে আমরা কতোটা সুবিধা পাচ্ছি আর কতোটাই বা সুবিধা পাবো?

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, ইটালি থেকে

শখ

– সরোজিত দাশ

পার্থর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই ক্লাস সিক্স থেকে। বরাবরই সে ভালো ছাত্র আর আমি সব সময় পেছনের বেঞ্চের। তবুও তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। আমরা দুজনে স্কুল জীবন থেকে ছিলাম প্রচণ্ড সিনেমাখোর।

একবার একটা সিনেমায় দেখলাম নায়কের চোখে কালো চশমা। দুজনের পছন্দ হয়ে গেল। তারপরের দিন দোকান থেকে কালো চশমা কিনলাম। এর জন্য দুজনকে বাবার পকেট ফাকা করতে হয়েছিল। পার্থ ধরা পড়েছিল এবং তাকে বাবার কাছে স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল।

যেদিন আমরা দুজন কালো চশমা পরে রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম তখন লোকজন আমাদেরকে আজব দেশের প্রাণীর মতো দেখছিল। যে কালো চশমায় নায়ককে নায়কের মতো দেখায় সে রকম চশমায় আমাদেরকে হয়তো হ্যামিলনের বাশিওয়ালার মতো দেখাচ্ছিল।

কি করে আমার চশমা হারিয়েছে তা আজ মনে নেই। কিন্তু পার্থর চশমা অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করলো।

এইচএসসি পাস করার পর আমরা মানিকজোড় একত্রে হেটে যাচ্ছি। দুজনের হাতে সিগারেট এবং তার চোখে কালো চশমা। হঠাৎ তার বাবার সঙ্গে পথে দেখা।

পথে কিছু বললেন না।

আমি প্রায় তিন মাস তাদের বাড়িমুখো হয়নি। তার কপালে কি জুটেছিল জানি না। তবে পরে জানলাম তার বাবা সেই ঘটনার পরে তাকে নাকি বলেছিল, পার্থ, হয় তোমাকে সিগারেট ছাড়তে হবে অথবা ওই সং মার্কা কালো চশমা।

পার্থ কালো চশমাটি ছাড়েনি।

পরে তার বাবা তাকে দামি চশমা কিনে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সে রাজি হয়নি।

এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পার্থর সঙ্গে পরিচয় হলো বড়লোকের একমাত্র মেয়ে কবিতার। তখন থেকে আমার সঙ্গে পার্থর দেখা-সাক্ষাৎও অনিয়মিত হলো। দেখা হলে সব সময় কবিতার গুণপনা বর্ণনা করতো।

কবিতা একদিন আমার সঙ্গে দেখা করলো। শেষে বললো, তোমার বন্ধুকে বলো যেন আমার সঙ্গে বেড়ানোর সময় ওই অদ্ভুত চশমা ব্যবহার না করে।

আমি বললাম। ফল হলো বিপরীত।

পার্থ বললো, কবিতাকে ছাড়তে পারি। কিন্তু আমার শখের চশমাকে নয়।

সব শেষে কবিতা জানালো, যদি ওই ভিলেইন স্টাইলের কালো চশমা পার্থ ব্যবহার করে তাহলে সে পার্থর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।

নেট রেজাল্ট পার্থ একা। তারপর কোনোদিন পার্থর সঙ্গে কবিতাকে দেখিনি।

পার্থ বরিশাল মেডিকালে চান্স পেল। প্রতি বছর বাড়ি এলে অনেক পরিবর্তন দেখি। আলট্রা মডার্ন প্যান্ট, শার্ট, ব্লেজার। কিন্তু চোখে সেই কালো চশমা। চিঠির মাধ্যমে জানলাম যে, এমবিবিএস শেষে ঢাকায় খুব নামকরা প্রাইভেট ক্লিনিকে সে চাকরি করছে।

তারপর একদিন ঢাকায় তার ঠিকানায় দর্শন দিলাম। যেদিন গেলাম তার আগের দিন পার্থ ক্লিনিকের চাকরি হারিয়েছে। কারণ জানলাম, ক্লিনিকের এমডি তার ওই কালো চশমা পরা অপছন্দ করেন।

তাকে অনুরোধ করলাম, পার্থ, তুই এবার এই কালো চশমাটি বাদ দে।

জীবনে এই প্রথম সে আমার প্রতি বিরক্ত হলো। শেষে বললো, ক্লিনিক ঢাকায় আরো আছে। অন্য জায়গায় না হয় কম বেতনে কাজ করবো। আমার শখ কারোর খুশির ওপর নির্ভর করবে না।

তারপর সময় অনেক কেটে গেছে। যমুনা বৃজের নিচ থেকে অনেক জোয়ার ভাটা প্রবাহিত হয়েছে। পার্থর বাবা মা আজ আর পৃথিবীতে নেই। তার মুখে শুনেছি, তার স্ত্রী নাকি সাংঘাতিক মুখরা। এই স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে সে এখন কালো চশমা পরে না। জানি না চশমাটি সে কি করেছে! আমিও কোনোদিন চশমার কথা তার কাছে শুনিনি।

সাতক্ষীরা থেকে

ব্যবসায়ী

– দেলওয়ার হোসাইন

আজকের গল্পটি চশমার গল্প নয়, চশমা বিক্রেতা ধূর্ত ব্যবসায়ীদের গল্প। আমার ধারণা ছিল, আমাদের মতো অনুন্নত দেশের ব্যবসায়ীরাই বুঝি সুযোগ পেলে ক্রেতাদের পকেট কাটে। কিন্তু এবার নিউ ইয়র্কে চশমা কিনতে গিয়ে আমার সে ভুল ধারণা বদল হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যে চশমা পরে নিউ ইয়র্ক-এ গিয়েছিলাম তার দুই লেন্সের পাওয়ারই ছিল নেগেটিভ এবং দুই। বায়তুল মোকাররম থেকে দুইশ টাকায় কেনা প্লাস্টিকের ফ্রেম ও কাচের লেন্সের চশমা বহুদিনের ব্যবহারে রঙ জ্বলে গেলেও পরে খুব স্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলাম বলে নতুন একটি চশমা কেনার তাগিদ বোধ করিনি।

যাদের চোখের পাওয়ার মাইনাস যা চোখের নিবিড় ব্যবহার বা প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ চোখের খুব কাছাকাছি বই এনে পড়াশোনার জন্য অল্প বয়সেই নিতে হয়, তা দিন দিন বাড়তে বাড়তে একটা অপটিমাম উচ্চতায় গিয়ে থেমে যায়। সেটা কারো বেলায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরেও হতে পারে আবার পঞ্চাশে গিয়েও হতে পারে।

তারপর শরীরের বাধনের নিম্নগামিতার সঙ্গে সঙ্গে ওই অপটিমাম গতি নিম্নমুখী হয়। অর্থাৎ পাওয়ার নিচের দিকে নামতে থাকে। এভাবে পাওয়ার কমতে কমতে কারো কারো পাওয়ার শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। তখন সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবশত, জীবিত থাকলে কয়েক বছর চশমা ছাড়াই জীবন শুরুর মতো নির্ঝঞ্ঝাট দৃষ্টি ফিরে পাবে। এভাবে কয়েক বছর চলার পর যারা বয়সের কারণে চল্লিশ বছরের পর রিডিং গ্লাস (পজিটিভ পাওয়ার) নিয়ে থাকেন তাদের মতো মাইনাসওয়ালাদের একই অবস্থা ঘটতে পারে সত্তর–এর কাছাকাছি গিয়ে।

আমার অপটিমাম লেন্সের পাওয়ার একটির তিন ও আরেকটির সাড়ে তিন ছিল। এক পর্যায়ে তা দুইয়ে নেমে আসে। মাইনাস দুই পাওয়ারের লেন্স দুটি বছর খানেক ব্যবহারে চোখে খুবই লাগসই হয়ে যায়।

ওই অবস্থায় নিউ ইয়র্ক গিয়ে বাধলো বিপত্তি। একদিন মেজ ছেলের একমাত্র ছেলে হৃদম খাটের মাথার দিকে খুলে রাখা চশমার ওপর বসে পড়ে। তার শরীরের চাপে ডান দিকের লেন্সটি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যায়।

ছেলে ও ছেলের বৌরা দেখে বললো, এখানে চশমা কেন, কোনো জিনিসই মেরামত হয় না। সেটির পরিবর্তে নতুন একটি কিনে নিতে হয়।

মেজ ছেলে বললো, ঠিক আছে আগামীকাল চোখ পরীক্ষা করে এক সেট নতুন চশমা কিনে নিলেই হবে।

এ কথা শুনে আতংকিত হই, নিশ্চয়ই তাতে বাংলাদেশের দশ বারোগুণ বেশি টাকা গুণতে হবে।

একমাত্র মেয়ের জামাই ম্যানহাটান–এর সাতান্ন স্ট্রটের দুই এবং তিন এভিনিউর মাঝামাঝি একটি ফার্মাসি–তে ফার্মাসিস্ট। ভাবলাম তাকে বললে হয়তো আমার চশমার ভাঙা কাচটি বদলানোর মতো কোনো উপায় বের করতে পারবে। মেয়ের বাসা একই বিল্ডিংয়ের তিন তলায়। পাচ তলা থেকে এক ফাকে চুপি চুপি গেলাম তার বাসায়। জামাইকেও পেলাম। তাকে বলতেই সে খোজ নিয়ে পরদিন জানাবে বলে জানালো।

পরদিন শুক্রবার। জামাই বাবাজি অফিস থেকে ফিরে এসে জানালো যে, সে খোজ নিয়েছে এবং তার পরিচিত এক চশমার দোকানের কর্মচারীকে বলে মাইনাস দুই পাওয়ারের একটি লেন্স আমার ভাঙা চশমায় অবৈধভাবে লাগানোর জন্য রাজি করিয়েছে। তার দোকানের সংশ্লিষ্ট মেকানিক দিয়েই তা করে দেবে। পরের সোমবার অর্থাৎ উইকএন্ডের পরবর্তী প্রথম ওয়ার্কিং ডে–তে আমার এক চোখ ভাঙা চশমা সে নিয়ে যাবে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাতে কতো খরচ হবে?

জবাবে সে আমাকে বললো, কোনো খরচই হবে না। চশমার দোকানি বা কর্মচারী তার পরিচিত। কোনো টাকা নেবে না।

আমি হাপ ছেড়ে বাচলাম।

জামাইয়ের সঙ্গে আমার চশমার ব্যাপারে আলাপ হয়েছে শুনে ছেলেরা খুব ক্ষিপ্ত হলো এ সামান্য জিনিসের জন্য তাকে জড়িত করায়।

শনিবার সন্ধ্যায় ছোট ছেলে তার গাড়িতে করে আমাদের মিয়া–বিবি দুজনকে এস্টোরিয়া–র ব্রডওয়ে–তে নিয়ে গেল গাড়িতে চড়েই সান্ধ্য ভ্রমণ করাতে। এস্টোরিয়া ব্রডওয়ে ও স্টেনওয়ে স্ট্রট হলো কর্মাশিয়াল এলাকা। ছেলেদের এপার্টমেন্ট থেকে চার পাচ স্ট্রট পূর্বে এবং মাত্র তিন চার এভিনিউ উত্তরে। ব্রডওয়ে–র পশ্চিমে একুশ নাম্বার স্ট্রট থেকে দক্ষিণে চল্লিশ স্ট্রট এবং এটিকে আড়াআড়িভাবে ক্রস করা স্টেনওয়ে স্ট্রটের স্টারবাক কফির দোকানে ঢুকে নরমাল কফি খেতে খেতে হঠাৎ ছেলের মনে পড়লো আমার চশমার কথা। স্টারবাক–এর বিপরীত দিকেই *আই ভিশন* নামের একটি নামকরা চশমার দোকান। ছেলে আমাকে এক প্রকার জোর করেই ওই দোকানে নিয়ে চশমার জন্য দোকানের চোখ পরীক্ষা রুমে ঢুকিয়ে দিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশেই প্রেসকৃপশন ছাড়া চশমা বিক্রি হয় না। প্রেসকৃপশন অনুযায়ী কাচ তারা পছন্দ করা ফ্রেমে ভরে বিক্রি করে। আরেকটি বিষয়, সাধারণত আমেরিকায় কোনো কাচের লেন্স বিক্রি হয় না। পরবর্তীকালে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে এক দোকানির কাছ থেকে জেনেছিলাম যে, কাচ ভঙ্গুর। তাই তারা চশমায় কাচের লেন্স ব্যবহারকে জাতীয় অপচয় বলে মনে করে।

সেই মুহূর্তেই আমার মস্তিষ্কে কথাটা নাড়া দিল। আমরাও প্লাস্টিকের চশমা ব্যবহার করলে আমাকে বিদেশ–বিভূইয়ে এই বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না। এখন অবশ্য কাচ এবং প্লাস্টিকের উভয় প্রকার লেন্স বাংলাদেশে সহজলভ্য হয়ে গেছে।

পরীক্ষক চোখ পরীক্ষা করে বললেন, তোমার ডান চোখের পাওয়ার বেড়ে গিয়ে বর্তমানে দাড়িয়েছে চার–এ। এ কথা শুনে পাওয়ার বেড়ে যাওয়ায় আতংকিত হলেও নতুন চশমা কেনার দুঃখ কিছুটা হলেও ভুলতে পারলাম। ভাবলাম, যাক, চশমার সঠিক সময়ে সঠিক পাওয়ারের লেন্স না লাগালে চোখের ক্ষতি হতে পারতো। বেশি দেরি না হয়ে ধরা পড়ায় খুশিই হলাম। পরীক্ষাগার থেকে বেরিয়ে ওয়েটিং বেঞ্চে বসলাম।

দোকানে দুজন বিক্রেতা। দুজনই সুন্দরী ও যুবতী। তারা এক এক করে ক্রেতা বিদায় করছে। দুই তিনজন ক্রেতা বিদায় করে দ্বিতীয় অল্প বয়স্কা সুন্দরী সেলসগার্ল, শীতের দিনেও যার ভি–কাট গলার উলের কামিজের ঊর্ধাংশ দিয়ে তার বিদ্রোহী বক্ষের এক–তৃতীয়াংশ বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সে চুইং গাম চিবুতে চিবুতে সহাস্য আহ্বান জানালো চশমার ফ্রেম পছন্দ করতে।

আমরা তিনজন। আমি, ছেলে ও ছেলের মা। দেশের মতো সোরগোল তুলে একটা ফ্রেম পছন্দ করলাম। দাম জিজ্ঞাসা করতে বললো, যদি এক সেট নিই তাহলে পড়বে আড়াইশ ডলার। আর দ্বিতীয় সেটসহ মোট তিনশ ডলার। তার মানে দাড়ালো মাত্র পঞ্চাশ ডলারে আরেক সেট। আমেরিকান ব্যবসায়ীরা খুব সেয়ানা। এক জোড়া জুতা কিনলে যেখানে নেবে বিশ ডলার, সঙ্গে একই জিনিস আরেকটি নিলে দেবে দশ ডলারে। অর্থাৎ গড়ে দুই জোড়া বা দুটির দাম পড়লো পনেরো ডলার করে। এতে ক্রেতা–বিক্রেতা দুজনই লাভবান। একজন কম দামে বেশি বিক্রি করে, আরেকজন অর্ধেক দামে অতিরিক্তি কেনে।

চশমার দাম শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। বাংলাদেশে এক ডলার ভাঙিয়ে পাওয়া যায় ষাট টাকা। অর্থাৎ আমার এক সেট চশমার দাম পড়বে পনরো হাজার টাকা। আর দুই সেটের দাম আঠারো হাজার টাকা। যেহেতু চোখ পরীক্ষা হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে আমাদের কাছে বিকল্প পথ আছে কম দামের ফ্রেম পছন্দ করা। তাতে দামের খুব বেশি হেরফের হবে বলে মনে হলো না। তবু ছেলেকে বললাম, কম দামি দেখো।

সে একটু রাগের স্বরেই বললো, তাতে কতোই বা ডলার বাচবে? খুব বেশি হলে একশ ডলার যেটা আমাদের কাছে একশ টাকার মতোই।

তবু নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হতে লাগলো।

ভাবছি, এ টাকাটা খরচ না করে জামাই বাবাজির মারফত একটা লেন্স তার পরিচিত চশমা বিক্রেতার কাছ থেকে নিলে আঠারো হাজার টাকা বাচাতে পারতাম। মনের ভেতর একটা খচখচ নিয়েই পছন্দ করা দুই সেট চশমার অর্ডার দিলাম।

ছেলের ক্রেডিট কার্ড ঘষে সুন্দরী বিক্রয়কারিণী চশমার দাম রেখে দুই দিন পর যেতে বললো।

আমার গল্পের এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু গল্পটির শিরোনাম দেয়া হয়েছে ব্যবসায়ী। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীর সব ব্যবসায়ীরাই ব্যবসায়ী। ক্রেতার হাতে একবার কিছু গছাতে পারলে তারা তাদের স্বার্থই ষোল আনা দেখবে। এতে ক্রেতার কতোটুকু লোকসান হলো সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। এটা সর্বোন্নত আমেরিকায়ও যেমন, স্বল্পোন্নত বাংলাদেশেও তেমন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতে তারা চালাকির আশ্রয় নিতেও ভ্রূক্ষেপ করে না। গল্পের বাকিটুকু এই চালাকির কথা।

যাক, নির্ধারিত দুদিন পর চশমার ডেলিভারি নিলাম। তিন চার দিন চশমা ছিল না। দূরের জিনিস ঝাপসা দেখে কোনোমতে কাটিয়েছি। বাইরে বের হলে মনে হতো এ সুন্দর পৃথিবীকে কতোদিন যেন প্রাণ ভরে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাড়াতাড়ি চশমা চোখে লাগালাম।

আমার সতীর্থ পাঠকদের সদয় জ্ঞাতার্থে মাইনাস পাওয়ার চশমার আরেকটি সুবিধার কথা বলি। মাইনাস পাওয়ার যতো বেশিই হোক, এটির ব্যবহারকারী চশমা ছাড়াই কিন্তু দশ পনেরো ফিট দূরের জিনিস স্পষ্টই দেখতে পাবে। এবং বই ও পত্রপত্রিকার লেখা যতো ছোটই হোক, চশমা খুলে পড়তে হবে। বাড়ির বাইরে যখন কোনো কিছু পড়ার দরকার পড়ে তখন চশমা খুলতে দেখলে ঘনিষ্ঠজন ছাড়া অনেকেই তা দেখে অবাক হন। তারা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তখন তাদের বলতে হয় আমার মাইনাস পাওয়ার। আমাকে চশমা খুলেই পড়তে হবে।

যাক সে কথা। দোকানের বাইরে এসে চশমার পাওয়ার কেমন হলো, বিশেষ করে ডান দিকেরটা। যেটার পাওয়ারের পরিবর্তন ঘটেছে সেটা দেখতে গিয়েই হুচট খেতে হলো। দূরের জিনিস ডান চোখে কিছুই দেখি না। বার বার চশমা খুলি আবার লাগাই। একবার বাম দিকে এক দেড়শ গজ দূরের সাইনবোর্ডের লেখা পড়তে চেষ্টা করি, আরেকবার ডান দিকের লেখা। কিন্তু ফল একই। দোকানে এসে সেলস গার্লকে (আজকের জন নতুন) অসুবিধার কথা বললাম। সে পাশের রুমেই চোখ পরীক্ষককে ইন্টারকমে বিষয়টি জানালো। তারপর বললো অপেক্ষা করতে।

নাতিদীর্ঘ অপেক্ষার পর আমার ডাক এলো ডাক্তারের চেম্বারে ঢোকার। ঢুকে দেখি আজ ডাক্তারও নতুন। একজন সত্তরঊর্ধ ছিল, আরেকজন মধ্য চল্লিশ বছর।

তিনি নেহায়েত অনিচ্ছা সত্ত্বে টুকটাক ডান চোখটি একটু পরীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে আগের ডাক্তার কিছু বলেনি তোমার ডান চোখ সম্পর্কে?

বললাম, না তো!

তার উত্তর, তোমার এ চোখে ক্যাটারাক্ট ধরেছে। সুতরাং একটু ঘোলাই দেখবে।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! আমার দেশি লেন্স দিয়ে তিন চার দিন আগেও স্পষ্ট দেখেছি। একটুকুও ঘোলা দেখিনি। আর তিন দিনেই আমার ক্যাটারাক্ট এতো দ্রুত এমন নির্দয় শক্র হয়ে গেল! বার বার প্রতিবাদ করলাম, তা হতে পারে না। তিন দিন আগেও দূরের পৃথিবীকে পৃথিবীর মতোই দেখেছি। নয়নাভিরাম। তিন দিনে আমার চোখের এমন অবনতি ঘটতে পারে না।

পরীক্ষক তর্ক না বাড়িয়ে বললেন, আমরা চোখের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নই। তুমি কোনো এমডিকে দেখাও। তিনি যে পাওয়ার নির্দেশ দেবেন আমরা তোমার লেন্স সে অনুযায়ী বদলে দেবো। এক মাসের মধ্যেই আসতে হবে। তবে আবার বলছি, তোমার চোখে অবশ্যই ক্যাটারাক্ট জন্মেছে। তিনি আরো বললেন, নতুন পাওয়ারের লেন্স পরেছো, কয়েক দিন ব্যবহার করলে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এবং আস্তে আস্তে আরো পরিষ্কার দেখবে।

আমার গত সাত আট বছর সাত আটবার উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ থেকে জেনেছি যে, আমেরিকানরা বেশি কথা কাটাকাটি পছন্দ করে না। অযথা কথাকে দীর্ঘায়িত করতেও অপছন্দ করে।

চশমার দাম আগেই ছেলে ক্রেডিট কার্ডে পরিশোধ করেছিল। দুই সেট চশমা হাতে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম প্রায় আকাশ থেকে পড়া উড়োজাহাজের মতো ভাঙা মন নিয়ে।

নতুন চশমা চোখে পরলেই ডান চোখে ভীষণ অস্বস্তি হয়। এমনিতেই ছেলের পকেটের তিনশ ডলার গচ্চা দিয়েছি। তাই নতুন করে চোখের কোনো এমডি ডাক্তারের কথা মুখে আনি না আরো দুই একশ ডলার খরচ হবে বলে। ফলে চুপি চুপি দেশে খবর পাঠালাম বায়তুল মোকাররমের নির্দিষ্ট দোকান থেকে মাইনাস দুই পাওয়ারের লেন্স দিয়ে এক সেট চশমা কিনে চুপি চুপি কারো হাতে দিয়ে দিতে।

দেশে থাকা বড় ছেলে দুই এক দিনেই কাজটি সমাধা করে ঢাকা এয়ারপোর্টে মাহবুব নামের এক ব্রুকলিন–এ বসবাসকারী আমেরিকানগামী বাংলাদেশির হাতে দিয়ে আমাকে টেলিফোনে জানালো।

আমি তার পরদিন এফ ট্রেন ধরে ব্রুকলিন–এর ম্যাকডোনাল্ড স্টেশনের কাছাকাছি চার্চ এভিনিউ থেকে মাহবুবের বাসা থেকে চশমা নিয়ে এলাম।

মাহবুব কুমিল্লার ছেলে। আমার বড় ছেলের চেয়ে বছর পাচেকের বড় হবে। দিনের মধ্য ভাগে গিয়েছিলাম তার বাসায়। মাহবুবের বৌ দুপুরের খাবার না খাওয়ে ছাড়লো না। বিদেশে দেশের মানুষ মানেই আত্মীয়। না খাওয়ে ছাড়ে কি করে?

দেশি চশমা চোখে দিতেই ঠিক আগের মতো দূরের দালান–কোঠা, গাড়ি, মানুষ, পাখি, ফুল দেখতে পেলাম। আর মনে মনে আই ভিশন–এর চোখ পরীক্ষক মনে মনে গালি দিয়ে খুবই আনন্দ অনুভব করলাম।

মানিকনগর, ঢাকা থেকে

কানা বৌ

– মন্নুজান

আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। প্রথমে পাত্র। তারপর তার মা এবং বোনেরা এসে দেখে যাওয়ার ব্যাপারটা যদিও আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর ঠেকেছে, তাও করার কিছু নেই।

এক সময় এ দেখাদেখির পালা শেষ হলো। এবার আসবেন পাত্রের বাবা সদলবলে। সঙ্গে তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এলেন। যার কথা আর প্রাণখোলা হাসিতে ঘরটি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন পৃন্সিপাল সাইদুর রহমান। যাযাদি সম্পাদকের পিতা।

বিয়ের পাকা কথাবার্তা হয়ে গেল। এবার আমার শ্বশুর আমাকে দেখতে চাইলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো, আমার চোখের জ্যোতি স্বল্পতার জন্য স্কুল জীবন থেকেই আমাকে চশমা নিতে হয়েছিল। ঘরের সবার কঠোর নিষেধ, এ মুহূর্তে আমাকে চশমা পরা চলবে না। কিন্তু আমি চশমা পরবোই। কেন পরবো না! যে চশমা আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। আমি তাদের ফাকি দেবো কেন? অগত্যা চশমা পরেই গেলাম। আমার শ্বশুরকে সালাম করে দাড়ানো মাত্র দেখলাম, স্নেহের অমিয়ধারা ঝরা দুটো চোখ আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, তুই চশমা পরেছিস কেন? চশমা খোল, বলে তিনিই আমার চশমা খুলে রাখলেন। তারপর পকেট থেকে একটি বাক্স বের করে তার থেকে চমৎকার একটি জড়োয়া টিকলি আমার মাথায় পরিচয় দিলেন। বললেন, এই তো আমার মাকে কতো সুন্দর দেখাচ্ছে!

যে মানুষ আমাকে এর আগে কখনো দেখেননি, প্রথম দেখাতেই আমাকে তুই বলে সম্বোধন করলেন! এ সম্বোধনে কতোটা আত্মিক ছিল, কতোটা স্নেহ ছিল তা এখানে কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম, কেদে দিলাম।

একজন জাদরেল পুলিশ অফিসারের কথায় এতোটা মমতা মাখানো থাকতে পারে, আমি ওই মুহূর্তে জানলাম। স্নেহে আপ্লুত হলাম, অভিভূত হলাম। মনে হলো, আমার মৃত বাবা যেন এ মুহূর্তে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। ভাবলাম, এই বৃদ্ধ ছেলেটির জন্য হলেও তার ছেলেটিকে আমার বিয়ে করা উচিত।

তারপর বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বাড়িতে ফিশফিশানি চলতে থাকলো। বৌ তো চোখে দেখে না। দেখার জন্য চোখে চশমা লাগাতে হয়। কানা বৌ!

এতে আমার স্বামীরও কিছুটা মন খারাপ। মুখে না বললেও আচরণে বুঝতে পারছিলাম।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটলো। খাটের ওপর বসে আছি, তিনি ঘরের এক প্রান্তে কোণায় দাড়িয়ে, হাতের একটি আঙুল দেখিয়ে বললেন, বলো তো কয়টা আঙুল?

মজা করার জন্যই বললাম, দশটা আঙুল। দেখলাম তার মুখের হাজার পাওয়ারের আলোটি একটি ফু–এর বাতাসে নিভে গেল!

বড্ড মায়া হলো। বললাম, চক্ষু বিশারদ ডাক্তার নামি গোপালবাবু আমার কাছে আপনি আসুন, আমি একটি আঙুলই দেখতে পেয়েছি, দশটা নয়। মন খারাপের কোনো কারণ নেই। আমি অতোটা কানা নই!

চট্টগ্রাম থেকে

অহংকারী

– লোপা

অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাসের সবাইকে বশ করে ফেললাম। সবাই আমার কথা মতোই চলে। শুধু ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী, মোটা ফ্রেমের চশমা, ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি ও *শান্তিনিকেতনী* ব্যাগ ঝোলানো ছেলেটি ছাড়া। কিছুতেই, কোনোদিক থেকেই বশীভূত করতে পারছিলাম না। সবদিক থেকে সে আমাকে হারিয়ে দিতো।

সবাই আমার কথা শুনলেও দেখা যেতো ওকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তাতে আমার রাগ আরো বাড়তো। এবং সবার কাছে শুনতাম অর্ণব আমাকে *অহংকারী* বলে।

মাথার মধ্যে সব সময় চিন্তা থাকতো সেই কানা বাবার কিভাবে ক্ষতি করা যায়। সবার কাছে জানতে পারলাম সেই কানা বাবা, চশমা ছাড়া সত্যিই কানা। চশমা ছাড়া তার পৃথিবী অন্ধকার।

ক্লাসের সবই বললো, যদি কানা বাবার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে পারি তাহলে আমি যা চাইবো তা–ই হবে।

যেই বলা সেই কাজ। ধীরে ধীরে সফল হলাম। তার সঙ্গে শত্রু ভাবাপন্ন ছেড়ে বন্ধু হলাম।

অর্ণব আমাকে ভালোবাসতে শুরু করলো।

সবাই বললো, আমি হেরে গেছি। অর্ণবকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।

তাদের কথা শুনে বললাম, এর ফল দুই দিন পরে দেখবি।

তাই হলো। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার আগের দিন ক্যাম্পাসে তাদের সবাইকে আসতে বললাম। সবাই ঠিক সময়ে এলো। অর্ণব আসার পর প্রথমেই যে কাজটি করলাম তা হলো, তার মোটা ফ্রেমের হাই পাওয়ারের চশমাটি ভেঙে ফেললাম যা দেখে সবাই অবাক হলো।

সবচেয়ে বেশি অবাক হলো অর্ণব এবং বললো, তুমি এ কাজ করলে? কাল আমাদের পরীক্ষা! আমার আর পরীক্ষা দেয়া হবে না। আমার পক্ষে এই মুহূর্তে টাকা রোজগার করে চশমা কেনা সম্ভব নয়। তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে।

তুমি আমাকে অহংকারী বলতে, তাই এতোদিন তোমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে আমি যে অহংকারী তা প্রমাণ করলাম। বলে বাড়ি চলে এলাম।

পরীক্ষার দিন দেখলাম সত্যি সত্যি অর্ণব পরীক্ষা নেয়নি। পরে জানতে পারলাম অর্ণবের একটা চশমা তৈরি করতে অনেক কষ্টকর ব্যাপার। এবং তাদের পরিবার চলে অর্ণবের টিউশনির টাকা দিয়ে। এখন তাও বন্ধ।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম অর্ণবকে সত্যি সত্যিই ভালোবেসেছি। অনেক কষ্টে অর্ণবের চশমার পাওয়ার জেনে একটি চশমা নিয়ে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

অর্ণবের বাসায় যাওয়ার পর সে চশমাটি নিলো এবং বললো, এই চশমা ছাড়া আমার জীবন সত্যিই অচল। তুমি আমাকে ভালোবেসে আমার জীবন নষ্ট করেছো। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করে তোমার জীবন নষ্ট করতে চাই না। তোমাকে আমার পরিবার সম্পর্কে অনেক বলতে চেয়েছি, তুমি শোনোনি। এখন বুঝতে পারছি কেন শোনোনি।

অর্ণবের কোনো কথা না শুনে তাকে বিয়ে করে ফেলি।

কিছু দিন যাওয়ার পরই বুঝতে পারি ভুল করেছি।
এই ভুল চরমে পৌছায়।
তাকে ছেড়ে আসার সময় আমার দেয়া চশমাটি ভেঙে দিয়ে আসি যা তার অহংকার চূর্ণ করতে পারে।

গাজীপুর থেকে

এক দফা এক দাবি

– এ.আর. আল কাযী

তার সঙ্গে প্রথম দেখা শৈশবে দূর থেকে। পরে সরকারি কর্মকর্তা বাবার জেলা প্রশাসক হওয়ার সুবাদে গোলাপের তোড়া হাতে তার সফরকালে অবসরের ফাকে মুখোমুখি সার্কিট হাউসে। বিস্মিত, সেই সঙ্গে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এক জগাখিচুড়ি অবস্থা আমার। তখনো বিমোহিত। তার চোখ দেখিনি।

তোড়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হোয়াট ইজ ইওর নেম।

মুখ ফশকে বলেছিলাম, মাই নেম ইজ অ্যাসকরবন! তখনকার ভিটামিন সি ট্যাবলেট, আমার খুব পছন্দের নাম ছিল।

স্মিত হাসি তার মুখে।

উদ্ধার করলেন বাবা।

মহীরুহের মতো সেই ব্যক্তি দাগ কেটে গেল। শিশু মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে গেল তার সবুজ কাচের রে–ব্যান (Ray-Ban) পাইলট গ্লাস।

শৈশবে খুব একটা প্রয়োজন বোধ করিনি। ঢাকা কলেজের উদ্দাম কৈশোরে মধ্যবিত্ত পরিবার কনিষ্ঠতম হওয়ার সুবাদে সাহস করে চেয়েছি। আকাশ ছোয়া দামের কথা শুনে বকা খেয়েছি। অতঃপর ভরসা মেড ইন ইনডিয়া। আসলে জিন্স, গলফ শার্ট, সিগারেটের সঙ্গে রে–ব্যান না হলে কি চলে!

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নবীনবরণের দিনেই প্রেমে পড়লাম। না কোনো সুন্দরীর প্রেমে নয়। ডিপার্টমেন্টের এক বড় ভাইয়ের সানগ্লাসের। বটল গৃন গ্লাসের রে–ব্যান পাইলট গ্লাস। এমন একটা হলে...।

সরকারি সফরে সরকারি কর্মকর্তা মা (আমার বাবা–মা দুজনেই সরকারি চাকুরে) জাপান যাচ্ছেন। বড় দুই ভাইয়ের লিস্টের পর আমার পালা। এক দফা এক দাবি, রে–ব্যান।

মায়ের নির্বিকার উত্তর, দেখবো।

আমার মায়ের দেখবো মানে বৌ–শাশুড়ির দেখা।

শাশুড়ি নামাজ পড়তে যাবার আগে দুধ গরম দিয়ে বৌকে দেখতে বলে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন দুধ বলক দিয়ে পড়ছে চুলায়।

বৌ–এর জবাব, মা সব দেখেছি, দুধ গরম হলো, বলক দিল, উপচে পড়লো, সব।

আশা ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ন মনে ক্যাম্পাসে ঘোরা আর ডিপার্টমেন্টে দেখা হলে নাদির ভাইয়ের সানগ্লাস দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

মা ফিরলেন, সুটকেস থেকে লিভাইস জিন্স বেরোয়, টি–শার্ট বেরোয়, ইউডিটি, এমনকি স্নিকার্সও। কিন্তু...! সবশেষে ছোট্ট ব্রাউন লেদার কভার। এতোটা খুশি এর আগে কোনোদিন হয়েছি বলে মনে পড়ে না। জীবন এতো সুন্দর!

তারপর কেটে গেছে এক যুগ। অতি ব্যবহারে সাধের রে–ব্যান এখন বৃদ্ধ। মা ছবি হয়ে গেছেন আজ চার বছর আগে। এর মাঝে চোখে উঠেছে এলপিনা (Alpina), পুলিশ (Police), গুচি (Gucci), এমনকি পিয়ের কার্দা (Pierre Cardine)। ক্যারেরা (Carrera) সযত্নে এড়িয়েছি এরশাদ পরতো বলে।

অনেক গ্লাস হারিয়েছে, ভেঙেছেও কম না। এখনো সেই রে-ব্যান আলমারিতে চামড়ার খাপে সযত্নে। চোখ পড়লেই মায়ের কথা মনে হয়। মনে পড়ে...নষ্টালজিক হয়ে পড়ি।

আমাকে বাস্তবে ফেরায় বৌ, কি করবে এটা দিয়ে?

হাসি। চার বছরের ছেলেকে দেখিয়ে বলি, আমি পরেছি, সে পরবে।

তুমি একটা পাগল!

বুকে টেনে নিতে নিতে বলি, পাগল না হলে কেউ আট বছর প্রেম করে?

মাকে থ্যাংকস জানানো হয়নি। মায়েরা বোধহয় সেটার প্রতীক্ষা করেন না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

aralquazi@yahoo.com

নিত্যদা

– মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

হতদরিদ্র নিত্যানন্দ হকারের এক চোখে ভাঙা সুতা দিয়ে বাধা গান্ধী চশমা, হাতে কাঠের বাটের ছাতা, বগলে শিশু সন্তানের মতো সযত্নে আগলে রাখা বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীগুলো। নিত্যদিন প্রভাতে নিত্যদা আমাদের বাসায় দৈনিক পত্রিকার যোগান দিতেন। পত্রিকা বিক্রি করে যে আয় হয় তাতে তার সংসারের চাকা ঘোরে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা, ভরা বর্ষা কিংবা কাল বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া তার হাসিকে কখনো ম্লান করে না। একটু দাড়ানোর কিংবা কারো সঙ্গে কথা বলার সময় তার নেই। নীরবে চলার পথে দরজার ফাক-ফোকরে তিনি সংবাদপত্র বিতরণ করেন। তার একচোখ ভাঙা চশমাটার প্রতি আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তবে এই চশমাটাই তাকে একজন পরিপূর্ণ হকারের রূপ দিয়েছিল।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে আমার আলাপ হতো। কখনো কখনো বাবার সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বের হতাম। তখন নিত্যদা বাসায় না গিয়ে রাস্তার ওপরেই পত্রিকাটি আমার হাতে দিতেন। সে সূত্রে তার সঙ্গে আমার সখ্যতা। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শবাদী অহিংসবাদী নিত্যদার মুখ থেকে হাসি সব সময় ঠিকরে পড়ে। গান্ধী চশমার ভেতর দিয়ে তিনি অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করে দেখতেন। চিরযুবা নিত্যদা হকারের অন্তর চোখ ছিল অতি প্রখর।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। বিকেলে থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। রাতে ভারী বর্ষণ হয়েছে। ভারী বর্ষণের মধ্যে আকাশে মেঘের গর্জনে বৃষ্টির ছন্দপতন ঘটেছে। ভারী বর্ষণের মধ্যে মেঘের গর্জন আমার মনে এক অজানা আশংকা বিরাজ করে। রাতে নির্ঘুম আমি।

পরদিন প্রভাতে বাবা ভ্রমণে বের হতে বললে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করি। পরক্ষণে লাল সূর্যের আভা যখন আমাদের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো তখন কালবিলম্ব না করে বাবার সঙ্গে ভ্রমণে বের হলাম। হঠাৎ মহাসড়কে কিছু লোকের জটলা চোখে পড়লো। ভিড় ঠেলে আমি আর বাবা এগিয়ে গেলাম। একি এ যে আমাদের নিত্যনন্দ হকার!

যন্ত্রদানবের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিত্যদা ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। মহাসড়কের ওপর তার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ। দূরে তার একচোখ ভাঙা চশমাটা সম্পূর্ণ অক্ষত। এই বীভৎস দৃশ্য আমার চোখ বিশ্বাস করতে পারছে না। নিত্যদার দেহ, পত্রিকা, ছাতা সব কিছু ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হলো। কিন্তু তার চশমাটা একেবারে অক্ষত। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, নিত্যদা তার চশমার মতো অক্ষত। কোনো যন্ত্রদানব তার প্রাণ কেড়ে নিতে পারে না। স্রষ্টার প্রতি আমার খুব রাগ হলো। মানুষ চোখে কম দেখে, অন্ধ হয়ে যায়। চোখ ভালো করার জন্য

চশমা পরে শৈল্য চিকিৎসার আশ্রয় নেয়। স্রষ্টা তো চোখে কম দেখে না, অন্ধ হয় না, তবু আজ নিত্যদার কেন এ অবস্থা হলো!

স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেমন খুশি তেমন সাজাতে অংশ নিতে আমাদের গণি মাস্টার তাগাদা দিচ্ছিল। ভাবছি কি সাজা যায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিত্যানন্দ হকারের কথা। হ্যা, আমি হকার সাজবো। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। কিছু পত্রিকা, বাবার চশমা, কাঠের বাটের ছাতা, কৃত্রিম দাড়ি গোফ লাগালাম। চশমাটা অযত্নে পরতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে একচোখ ভেঙে গেল। তাতে নিরাশ না হয়ে কাগজ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে, সুতা দিয়ে বেধে চোখে দিলাম। তারপর মাঠের চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাক-ডাক দিচ্ছি *পেপার, পেপার, এই পেপার, সাময়িকী...।*

কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক খেলাচ্ছলে পত্রিকা ও সাময়িকী কিনলেন। খেলা শেষে বিচারক মণ্ডলী আমাকে প্রথম হবার ঘোষণা দিলেন। প্রথম হবার ঘোষণা শুনে আমার জীবাত্মা যদিও খুশি হলো, কিন্তু পরমাত্মার খুব রাগ হলো। পরমাত্মা যেন বলতে চায়, নিত্যদার মতো আমার কেন মৃত্যু হলো না। পরমাত্মা কখনো চোখে কম দেখে না, অন্ধ হয় না, দেখার জন্য চশমা লাগে না।

ফেনী থেকে

দুটি

– মানিতা আফ্রোদিতি

আমার ভাই মাসুদুর রহমান টিটু খুব স্মার্ট ও সুদর্শন। তবে মাঝে মধ্যে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে, কোনো কিছুই তার খেয়াল থাকে না।

কিছু কেনাকাটার জন্য একদিন দুপুর তিনটায় টিটুকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যাই। কেনাকাটা করতে সন্ধ্যা লেগে যায়। কি কারণে জানি না টিটু সেদিন খুবই অন্যমনস্ক ছিল। নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে বেবিট্যাকসি না পেয়ে আমরা রিকশা ভাড়া করি। খেয়াল করছিলাম যে, অনেকেই আমাদের দিকে অবাক চোখে তাকাচ্ছিল, বিশেষ করে মেয়েরা। কেউ মুচকি হাসছে, কেউ হাসতে হাসতে আমাদের দিকে আঙুল দিয়ে পাশের জনকে দেখাচ্ছে।

আমাদের রিকশার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি মেয়ে বলে উঠলো, অন্ধ নাকি।

পাশের মেয়েটি উত্তর দিল, চোখের পাওয়ার বেশি তো, তাই কমিয়ে রেখেছে।

রাত আটটার দিকে মালিবাগ মোড়ে রিকশায় তিনজন ইয়াং ছেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

আমি চকিতে টিটুর দিকে তাকিয়ে দেখি বেআক্কেলটি এ রাতেও চোখে সানগ্লাস দিয়ে বসে আছে। ধাক্কা দিয়ে টিটুকে বলে উঠি, এই গাধা, রাতের বেলায়ও তোমার সূর্যের আলো লাগে নাকি যে, সানগ্লাস লাগিয়ে বসে আছো?

তখন টিটুর হুশ হয়। চটজলদি গ্লাসটি খুলে পকেটে রাখতে রাখতে সে বলে, ও! তাই তো বলি বিদ্যুতের ভোল্টেজ নেই কেন?

এইচএসসি সার্টিফিকেটে নামের ভুল সংশোধন করার জন্য কিছু কাগজপত্র কলেজের অধ্যক্ষকে দিয়ে সত্যায়িত ও তার সুপারিশ আনতে একদিন কলেজে গেছি। অনেকে জিজ্ঞাসা করে চোখে সমস্যা কি না।

আমি হুম বলে উত্তর দিই।

কাজ শেষ করে আসার পথে ইংরেজিস্যারের সামনে পড়লে তাকে সালাম দিই।

স্যার বলেন, দাড়াও, তুমি কি জানো না, সিনিয়রদের সামনে সানগ্লাস পরা বেয়াদবি?

কোনো রকমে জানাই চোখের ইনফেকশনের কথা।

স্যার রেগে বলেন, হোক ইনফেকশন, চোখ পচে গেলেও এটা আর করবে না। সানগ্লাস খোলো।

অগত্যা সানগ্লাস খুললে স্যার আমার চোখের অবস্থা দেখে শিউরে উঠে বলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে।

আমি বলি, না স্যার, এটা বেয়াদবি।

স্যার শুধু ঠিক আছে বলেই পাশ কেটে চলে যান।

রামপুরা, ঢাকা থেকে